মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছ চাষ
প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা

সম্পাদনা

কৃষিবিদ মোহাম্মদ সায়েদুল হক

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)

বাড়ী-১৮, রোড-০৫, ব্লক-এ মিরপুর-০২, ঢাকা-১২১৬।

ফোন ও ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯০০৫৪৫২,৮৮০-২-৯০১৪৯৩৩,

E-mail ঃ zalam_idf@yahoo.com

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	ফ্যাসিলিটেটর
০১	প্রশিক্ষণ মডিউল : মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছ চাষ	
০২	আইডিএফ পরচিতি	
০৩	কোর্স সম্পর্কিত কিছু কথা	
০৪	প্রশিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা	
০৫	কোর্সের সার্বিক উদ্দেশ্য	
০৬	মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের সিডিউল	
০৭	অধিবেশনঃ-১: পুকুরের পাড় সংস্কার ও জলজ আগাছা দমন	
০৮	অধিবেশনঃ-২: রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূরীকরণ	
০৯	অধিবেশনঃ-৩: চুন প্রয়োগ	
১০	অধিবেশনঃ-৪: পুকুর প্রস্তুতকালীণ সময়ে সার প্রয়োগ	
১১	অধিবেশনঃ-৫: পুকুরের পোনা ছাড়ার উপযোগী পরিবেশ ও প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যবেক্ষণ এবং পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা ও প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা	
১২	অধিবেশনঃ-৬: পোনার জাত, মজুদ ঘনত্ত্ব ও অনুপাত নির্ধারণ	
১৩	অধিবেশনঃ-৭: পুকুরের মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ পদ্ধতি	
১৪	অধিবেশনঃ-৮: পোণা পরিবহন, অভ্যস্থকরণ ও পুকুরে অবমুক্তকরণ	
১৫	অধিবেশনঃ-৯: মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগ	
১৬	অধিবেশনঃ-১০: মজুদ পরবর্তী সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ	
১৭	অধিবেশনঃ-১১: নমুনায়নের মাধ্যমে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পরবর্তী করণীয়	
১৮	অধিবেশনঃ-১২: মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষে কিছু সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধান	
১৯	অধিবেশনঃ-১৩: এক নজরে মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাষ পদ্ধতি	
২০	অধিবেশনঃ-১৪: মাছের বিভিন্ন রোগ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা	
২১	অধিবেশনঃ-১৫: আংশিক আহরণ ও পুনঃমজুদ	

আইডিএফ পরিচিতি

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন "আইডিএফ" গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী এন্ড ফার্মস এর সোসাইটিজ ACT XXI OF ১৮৬০ এর অধীনে রেজিষ্ট্রিকৃত এস-১৫৫১(১১১)/৯৩ একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়াও আইডিএফ বাংলাদেশ সরকারের এন.জি.ও বিষয়ক ব্যুরো (নিবন্ধন নম্বর ঃ ৯৪১,তারিখ ২৮/০৫/১৯৯৫ইং) এবং মাইক্রো-ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (সনদ নংঃ-০১৯২০-০১৮৭২-০০২৪৯,তারিখ-১৪/০৫/২০০৮ইং) তে নিবন্ধন প্রাপ্ত। বিনা জামানতে পার্বত্য অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও সুবিধা বঞ্চিত এলাকার জনগণকে ঋণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে দারিদ্রের দুষ্ট চক্র থেকে মুক্ত করতেই এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু। ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে আইডিএফ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কর্মকান্ড শুরু হয় ১৯৯৩ থেকে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী ছাড়াও এ সংস্থা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেনিটেশন, বিশুদ্ধ পানি, উন্নত চুলা, পশু মোটাতাজাকরণ, সৌরশক্তি, মৎস্য ও ভিক্ষুক কর্মসূচী পরিচালনা করছে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ঢাকা,রাজশাহী, নাটোর, গাজীপুরসহ মোট ১৩ টি জেলায় ৭৮ টি শাখা অফিসের মাধ্যমে অত্র সংস্থা ভূমিহীন ও বিত্তহীনদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী ছাড়াও এ সংস্থা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নত চুলা, পশু মোটাতাজাকরন, সৌরশক্তি, মৎস্য ও ডিগনিটি কর্মসূচী পরিচালনা করছে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর আ্যাওতাধীন জেলা ছাড়াও সৌরশক্তি কর্মসূচী ফেনী, নোয়াখালী, চান্দপুর, কুমিল্লা জেলায় বাস্তবায়ন হচ্ছে ।

আইডিএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা জনাব জহিরুল আলম। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে পড়াশোনা কালেই গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের উন্নয়ন কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ও জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থায় চাকুরী শেষে ১৯৯২ সালে দেশে ফিরে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ শুরু করেন। নোবেল বিজয়ী ড ঃ মোহাম্মদ ইউনূস, তাঁর সহকর্মী, শিক্ষক, বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীগণ এ সময়ে তাঁকে এ কাজে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যোগান। ১৯৯৩ সালে গ্রামীণ ট্রাস্টের সহযোগীতায় বান্দরবান জেলার সুয়ালক মৌজায় "সুয়ালক শাখা" শাখার মাধ্যমেই এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম শুরু হয়।

কোর্স সম্পর্কিত কিছু কথা:

মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা, মাছ আহরন প্রশিক্ষণ কোর্সটি মাছ চাষী সংগঠনের সদস্যদের জন্য একটি মৌলিক প্রশিক্ষণ । সংগঠনের নির্বাচিত সদস্যগন এই প্রশিক্ষনে অংশ নিবেন। প্রশিক্ষনার্থীদেরকে মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছ চাষের কৌশল শিখানোই এ কোর্সের মূল উদ্দেশ্য। প্রশিক্ষনার্থীগন সফল ভাবে উক্ত প্রশিক্ষন গ্রহণ করে মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছ চাষের উপর বিশেষ দক্ষতা ও জ্ঞান লাভ করবেন।

উক্ত কোর্সটিতে প্রতিটি অধিবেশনের জন্য আলাদাভাবে অধিবেশন পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে এবং অনুশীলনে প্রশিক্ষকের অনুসরণের জন্য পদ্ধতিগুলো লেখা হয়েছে। লিখে দেয়া পদ্ধতিগুলো অবশ্যই পালন করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে নির্দেশিত অধিবেশন পরিকল্পনা ও সংযুক্ত হ্যান্ড আউটের বাইরে কিছু না বলাই ভাল এবং যিনি প্রশিক্ষণ কোর্সটি পরিচালনা করবেন বা কোন একটি অধিবেশন পরিচালনা করবেন তিনি একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষক। সুতরাং তিনি তার ইচ্ছামতো পরিবেশ বুঝে পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। তবে প্রতিটি অধিবেশনের উদ্দেশ্য যেন অর্জিত হয় সেদিকে খেয়াল রাখা বাঞ্ছনীয়, কেননা মুল কোর্সের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্ক রেখে প্রতিটি অধিবেশনের উদ্দেশ্য ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষকগণ অধিবেশনগুলো পরিচালনার জন্য পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে অবশ্যই সময়মত প্রতিটি অধিবেশন শেষ করার চেষ্টা করবেন যাতে কোন সেশনই সদস্যদের কাছে বিরক্তিকর মনে না হয়। অধিবেশন পরিকল্পনায় প্রতিটি অধিবেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মেয়াদ, সময় বন্টন ও প্রশিক্ষন কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে বিবরন দেয়া হয়েছে যা প্রশিক্ষকের জন্য একটি চেকলিষ্ট হিসাবে কাজ করবে। এ ছাড়া প্রশিক্ষক প্রতিটি অধিবেশন শেষে অধিবেশন পরিকল্পনায় উল্লেখিত ও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের আলোকে সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করে নিতে পারেন। এতে অধিবেশনটি পর্যালোচনায় ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে।

প্রশিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা:

প্রশিক্ষক অত্যন্ত সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষা এবং স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলবেন।
এমনভাবে কথা বলবেন যেন সকল প্রশিক্ষণার্থী শুনতে পান। আবার খুব উচ্চস্বরে কথা বলে তাদের বিরক্তি ঘটানো যাবে না।
প্রশিক্ষণের শুরুতেই সকল প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আন্তরিকভাবে কথা বলতে হবে যেন তারা জড়তা ভেংগে মনোযোগ দিয়ে বিষয়গুলি উপলব্ধি করতে পারেন। মাঝে মাঝেই প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে হবে তারা প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু উপলব্ধি করতে পারছে কিনা।
প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যেকটি বিষয়েই প্রশ্ন করতে উৎসাহ দিতে হবে এবং প্রশ্ন করলে আন্তরিকতার সাথে তার উত্তর দিতে হবে। কোন প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলে ভুল উত্তর দেয়া যাবে না এবং সঠিক উত্তর প্রদানের জন্য সময় নিতে হবে।
প্রতিটি আলোচ্য বিষয় শেষ হলে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন করে দেখতে হবে তারা কতটুকু বুঝেছে। কোন জিনিষ না বুঝলে পুনরায় তাদের বুঝাতে হবে। কোন নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক প্রভাবিত হওয়া ঠিক নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রশিক্ষক কোন একজন বিশেষ প্রশিক্ষণার্থী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তার সাথেই বেশী যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীগণের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে।
প্রশিক্ষণের শেষে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু যেন প্রশিক্ষণার্থীরা মুখস্ত বলতে পারে সেভাবে বার বার নিজে বলে ও প্রশিক্ষণার্থীদের দ্বারা বলিয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে প্রশিক্ষণ শুরু ও শেষ করতে হবে।
প্রশিক্ষণের সুবিধার্থে কোন উপকরণ প্রশিক্ষণার্থীদের প্রদর্শনের প্রয়োজন দেখা দিলে পূর্বেই তার ব্যবস্থা করে প্রশিক্ষণের সময় প্রদর্শন করতে হবে।

অধিবেশনঃ-১

পুকুরের পাড় সংস্কার ও জলজ আগাছা দমন

পুকুর সংস্কার ঃ

পুকুর সংস্কার করা মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী। পুকুর সংস্কারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে হবে-

- পাড় মেরামত
- পাড়ের ঢাল মেরামত
- তলার অতিরিক্ত ও পঁচা কাদা অপসারণ
- তলদেশ সমানকরণ
- পুকুরের পানিতে ছায়া সৃষ্টিকারী পাড়ের বড় গাছের ডালপালা কেটে ফেলা ও পুকুর পাড়ের ঝোপঝাড় পরিস্কার করা।

পাড় মেরামত ঃ

- পুকুরের পাড় এমন উঁচু করতে হবে যাতে স্বাভাবিক বর্ষায় ডুবে না যায়।
- পাড় ভাঙ্গা থাকলে তা শক্ত করে বেধে দিতে হবে যাতে বাইরের রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে।
- পাড়ের গায়ে গর্ত থাকলে তা ভরে দিতে হবে যাতে বাইরের পানি চুইয়ে পাড় ভেঙ্গে ফেলতে না পারে।

পাড়ের ঢাল মেরামত ঃ

- পুকুর পাড়ের ঢাল ভাঙ্গা থাকলে বা ঢালের গায়ে গর্ত থাকলে তা মেরামত করতে হবে। তাহলে পাড় সহজে ভাঙ্গবে না।
- পাড়ের ঢাল ২:১ অনুপাতে রাখা দরকার। এতে পাড় ভেঙ্গে পড়বে না, জাল টানা সহজ হবে এবং সঠিকভাবে মাছ আহরণ করা যাবে। এছাড়া সূর্যের আলো কার্যকরভাবে পুকুরের পানিতে পড়ায় প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন সহায়ক হবে।

তলার অতিরিক্ত ও পঁচা কাদা অপসারণঃ

পুকুরের তলার ৪-৬ ইঞ্চির বেশি কাঁদা থাকলে তা তুলে ফেলতে হবে। তলায় অতিরিক্ত জৈব পদার্থ থাকলে-

- বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি হতে পারে
- পোণার চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়
- সহজে হররা টানা যায় না
- অক্সিজেনের অভাব হতে পারে।

তলদেশ সমানকরণঃ

- তলদেশে গর্ত বা উঁচু-নিচু থাকলে সমান করে দিতে হবে। এতে জাল ও হররা টানা সহজ হয় এবং কার্য্যকরভাবে পোনা আহরণ সম্ভব হয়।

পাড়ের বড় গাছের ডালপালা ছাটাইকরণঃ

- পুকুরের পানিতে ছায়া সৃষ্টিকারী বড় গাছের ডাল-পালা কেটে ফেলতে হবে। এতে সূর্যের আলো সহজে ও কার্য্যকরভাবে পুকুরের পানিতে পড়বে যা প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক হবে।

পুকুর পাড়ের ঝোপঝাড় পরিষ্কারকরণ ঃ

- পুকুর পাড়ের ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করত হবে। এতে মৎস্যভূক প্রাণী সেখানে লুকিয়ে থাকতে পারবে না।
- পুকুর থেকে পুষ্টি শোষণ করে পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারবে না।

জলজ আগাছা দমন ঃ

পুকুরের পানিতে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদ, যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভবে মাছের উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পুকুরে সাধারণত: ৩ ধরনের জলজ আগাছা ও শেওলা দেখা যায় যেমন-

ক. ভাসমান; খ. লতানো; এবং গ. নিমজ্জিত

ক. ভাসমান ঃ

যে সমস্ত আগাছা পানির উপর ভেসে থাকে তাদেরকে ভাসমান জলজ আগাছা বলে। এরা আবার দুই ধরনের হতে পারে-

১. মুক্তভাবে ভাসমান: এরা পানি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে থাকে, যেমন- কচুরীপানা, টোপাপানা, ক্ষুদিপানা ইত্যাদি।

২. মূল মাটিতে এবং পাতা উপরে- এরা মাটি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে থাকে। যেমন- শাপলা, পানি ফল ইত্যাদি।

খ. লতানো ঃ

এ জাতীয় উদ্ভিদের শিকড় পুকুরের ঢালু পাড়ে পানি নিচে আটকানো থাকে এবং কান্ড ও পাতা পানিতে ছড়িয়ে থাকে। এসব উদ্ভিদ পানি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে থাকে, যেমন- কলমীলতা, হেলেঞ্চা, কেশরদাম ইত্যাদি।

গ. নিমজ্জিত ঃ

এ ধরনের জলজ আগাছা পানির তলদেশে থাকে। এদের শিকড় মাটিতে থাকে এবং পাতা বা ডাল কখনই পানির উপর আসে না। যেমন-ঝাঁঝি, কাঁটাশেওলা ইত্যাদি।

জলজ আগাছার ক্ষতিকর দিকসমূহ ঃ

সব ধরনের জলজ আগাছা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাছ চাষে বেশ কিছু ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। মাছ চাষের ওপর জলজ আগাছার উল্লেখযোগ্য কিছু ক্ষতিকর প্রভাব হলো-

- এরা পুকুরের মাটি ও পানি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে। ফলে পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা কমে যায়।
- পানিতে সূর্যালোক প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে ফলে সালোকসংশ্লেষণ বাধাগ্রস্থ হয়।
- মাছের সহজ চলাচলে ব্যাঘাত ঘটায়, ফলে সহজে রাক্ষুসে প্রাণীর শিকারে পরিণত হয়।
- শিকারী মাছ ও প্রাণীর আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে।
- পুকুরে সহজে হররা টানা যায় না।
- জাল টানায় অসুবিধা সৃষ্টি করে।

জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ঃ

১. কায়িক শ্রম পদ্ধতি ঃ

পুকুরের যাবতীয় আগাছাকে দা/কাঁচি দিয়ে কেটে তুলে ফেলা যায়। কখনও কখনও পুকুরে দড়ি টেনে আগাছার শিকড় আলাদা করে পরে টেনে তোলা যায়। পুকুরের তলদেশে শাপলা/শালুকের মূল যদি থাকে তবে আঁচড়া দিয়ে উপরিয়ে ফেলতে হবে।

২. জৈবিক পদ্ধতি ঃ

অনেক মাছ আছে যারা জলজ আগাছা খেয়ে আগাছা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, যেমন-গ্রাস কার্প। এ ছাড়া মিরর কার্প ও কার্পিও মাছ ডুবন্ত উদ্ভিদের শিকড় তুলে ফেলে।

৩. সার প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

পুকুরে ডুবন্ত উদ্ভিদ থাকলে বেশি পরিমাণে অজৈব সার প্রয়োগ করে তা দমন করা যায়। যদি পুকুরে ডুবন্ত উদ্ভিদ, যেমন- নাজাজ থাকে তাহলে প্রতি শতাংশে ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে ২-৩ দিনের মাঝে পুকুরে সবুজ স্তরের সৃষ্টি হয়। ফলে সূর্যালোক না পাওয়ার ফলে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সমস্ত উদ্ভিদ (নাজাজ) মারা যায়। পুকুরে অতিরিক্ত শেওলা থাকলে কম পানিতে ০.৫ পিপিএম তুঁতে প্রয়োগ করে শেওলা দমন করা যায়। উল্লেখ্য যে, চুন দেওয়ার ৭ দিন পূর্বে তুঁতে দিতে হবে।

অধিবেশনঃ-২

রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূরীকরণ

পুকুর হতে রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূরীকরণ আধুনিক মৎস্য চাষের একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। পুকুরের এসব মাছের উপস্থিতি নানাভাবে মাছের উৎপাদনকে ব্যাহত করে, ফলে ভাল ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও সন্তোষজনক উৎপাদন পাওয়া যায় না। তাই পোনা মজুদের পূর্বে পুকুর হতে অবশ্যই সমস্ত রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূর করতে হবে।

রাক্ষুসে মাছ ঃ

যে সমস্ত মাছ অন্য মাছকে ধরে খায় তাদেরকে রাক্ষুসে মাছ বলে। এরা মাছ খেয়ে ফেলে, ফলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যেমন- শোল, বোয়াল, চিতল, ফলি, কাকিলা, বাইল্যা, টাকি/লাটি, চ্যাং, মাগুর ইত্যাদি।

অবাঞ্ছিত মাছ ঃ

যে সমস্ত মাছ সরাসরি অন্য মাছকে খায় না কিন্তু মাছের সাথে খাদ্য, বাসস্থান এবং অক্সিজেন নিয়ে প্রতিযোগিতা করে তাদেরকে অবাঞ্চিত মাছ বলে। পুকুরে এ ধরনের মাছ থাকলে খাদ্যের অপচয় হয় এবং সার্বিক উৎপাদন অনেক কমে যায়। যেমন- মলা, ঢেলা, চাপিলা, পুটি, চান্দা, ইচা (ছোট চিংড়ি) বইচা ইত্যাদি।

রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছের ক্ষতিকর প্রভাব ঃ পোণা মজুদের পূর্বে পুকুর থেকে রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ সরিয়ে ফেলতে হয়। কারণ-

- রাক্ষুসে মাছ সরাসরি পোণা খেয়ে ফেলে। যেমন- রাক্ষুসে মাছ ২ কেজি বড় হতে প্রায় ১০-১২ কেজি অন্য মাছ খায়।
- অবাঞ্ছিত মাছ চাষকৃত মাছের খাদ্য নষ্ট করে যেমন-১ কেজি অবাঞ্চিত মাছ ১০-১২ কেজি বড় মাছের খাদ্যে ভাগ বসায়।
- বাসস্থান ও অক্সিজেন নিয়ে প্রতিযোগিতা করে।

রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দমন পদ্ধতি ঃ

পুকুর হতে দুইভাবে রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূর করা যেতে পারে। যেমন-

১। পুকুর শুকিয়ে এবং ২। বিষ প্রয়োগ করে।

১. পুকুর শুকানো ঃ

বাজে পোকা-মাকড়, রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ মারার জন্য পুকুর শুকানো সবচেয়ে ভাল। পাম্প ব্যবহার করে এ কাজটি করা যায়। শুকানোর পর কড়া রোদে পুকুর বেশ কয়েকদিন ফেলে রাখতে হবে যেন তলা দিয়ে হেটে গেলে পায়ের দাগ পড়ে কিন্তু পা ডুবে না যায়। এ কাজটি ফেব্রুয়ারী-মার্চে করলে খরচ ও সময় দুই'ই কম লাগে।

২. বিষ প্রয়োগ ঃ

পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে ঔষধ প্রয়োগ করে রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূর করা যায়। পুকুর হতে রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূরীকরণের জন্য রোটেনন, চা বীজের খৈল বা তামাকের গুড়া ব্যবহার করা যেতে পারে। এ গুলোর কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। যেমন- রোটেনন, চা বীজের খৈল ও তামাকের গুড়া জৈব উৎস হতে উৎপন্ন

- এসব ঔষধ জৈব সার হিসেবে কাজ করে
- এগুলো প্রয়োগে মাছ মারা যায়, চিংড়ি ও জলজ কীট মারা যায় না
- এসব ঔষধ মাছের ফুলকায় আক্রমণ করে ফিলামেন্ট বন্ধ করে দেয়, ফলে দম বন্ধ হয়ে মাছ মারা যায়।

ব্যবহৃত ঔষুধসমূহের বিবরণ, প্রয়োগমাত্রা ও পদ্ধতি

রোটেনন পাউডার ঃ

রোটেনন হচ্ছে ডেরিস গাছের মূল থেকে তৈরি এক ধরনের পাউডার, যা দেখতে হালকা বাদামী রংয়ের। রোটেনন প্রয়োগে মাছ মারা যায়, চিংড়ি ও অন্যান্য জলজ কীট মারা যায় না।

ব্যবহার মাত্রা ঃ

বাজারে দু'ধরনের শক্তির রোটেনন পাওয়া যায়, যেমনঃ ৯.১% এবং ৭% শক্তি সম্পন্ন রোটেনন। রোটেননের মাত্রা নির্ভর করে এর শক্তির ওপর। কড়া রোদের মধ্যে পানিতে রোটেননের মাত্রা কিছুটা কম লাগে। আবার তুলনামূলক ঠান্ডা পানিতে রোটেননের মাত্রা বেশি লাগে।

বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন রোটেননের শতাংশ প্রতি মাত্রা

শক্তি (%)	সাধারণ পরিমাপক (গ্রাম/ফুট পানি/শতক)
৯.১	১৮-২০গ্রাম
৭	২৫-৩০ গ্রাম

ব্যবহার পদ্ধতি ঃ

প্রয়োজনীয় পরিমাণ পাউডার বালতিতে নিয়ে আস্তে আস্তে পানি মিশিয়ে প্রথমে 'কাই' তৈরি করতে হবে। প্রস্তুতকৃত কাঁই তিনভাগে ভাগ করে, এক ভাগ দ্বারা ছোট ছোট বল বানাতে হবে এবং বাকী দু'ভাগ প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি মিশিয়ে তরল করতে হবে। প্রথমে ছোট ছোট বলগুলো সমস্ত পুকুরের পানিতে সমান ভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে এবং পাশাপাশি তরলীকৃত অংশও পুকুরের পানিতে ছড়াতে হবে। ২০-২৫ মিনিট পর আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে জাল টেনে মাছ ধরতে হবে।

বিষাক্ততার মেয়াদকাল ঃ প্রায় ৭ দিন।

সতর্কতা ঃ

রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করার পদ্ধতি নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয়ের ওপর নজর রাখা প্রয়োজন-

- পুকুরে ঔষধ ব্যবহার করা হলে এলাকাগত প্রাপ্যতা, মূল্য, বিষাক্ততার মেয়াদকাল, পুকুরের সামাজিক ব্যবহার, জনস্বাস্থ্যের ওপর প্রতিক্রিয়া- এ বিষয় গুলো খুব ভালভাবে বিবেচনা করতে হবে।
- পুকুর শুকনো হলে রেণু/ধানী সরবরাহের সময় এবং পানির বিকল্প উৎসের (গভীর/অগভীর নলকূপ) বিবেচনায় রাখা উচিত।

অধিবেশন ঃ ৩

চুন প্রয়োগ

চুন ক্যালসিাম সমৃদ্ধ অজৈব যৌগ যা মৎস্য চাষে অত্যাবশকীয় একটি উপাদান।

চুন প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ঃ

- মাটি ও পানির pH কে মাছ চাষের উপযোগী রাখে।
- পানিতে ক্ষারত্বের পরিমাণ ২০ মি. গ্রাম./লি. এর বেশি রাখতে সহায়তা করে।
- সারের কার্যকারীতা বৃদ্ধি করে।
- পুকুর প্রস্তুতকালীন চুন প্রয়োগের মাধ্যমে পরজীবী ও রোগজীবাণু দূর করে।
- পুকুর তলায় জৈব পদার্থের পচন প্রক্রিয়া তরান্বিত করে।
- চুনের ক্যালসিয়াম নিজেই একটি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান।
- কাঁদায় আবদ্ধ ফসফরাস মুক্ত করে।

চুন প্রয়োগের উপকারিতা ঃ

ক. হাইড্রোজেন ও হাইড্রোক্সিল আয়নের ভারসাম্য বজায় রাখতে অর্থাৎ পানিকে নিরপেক্ষ রাখতে সহায়তা করে, ফলে প্লাংকটনের বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় পরিবেশ বজায় থাকে।

খ. প্লাংকটনের বৃদ্ধির জন্যে ক্যালসিয়াম ও গুরুত্বপূর্ণ আয়ন সমূহ প্রদান করে থাকে। ক্যালসিয়াম ও সিলিকা জীবের দৈহিক কাঠামো গঠনে সহায়তা করে থাকে।

গ. সালোক সংশ্লেষণের জন্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সরবরাহ বাড়ায়।

ঘ. প্লাংকটনের বৃদ্ধির জন্যে কাদায় আবব্ধ ফসফরাসকে মুক্ত করে।
ঙ. জৈব পদার্থের পচন ক্রিয়া তরান্বিত করে, ফলে পানিতে পুষ্টি সরবরাহ বৃদ্ধি পায়।
চ. পরজীবী ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে।
ছ. পানির ঘোলাত্ব দূর করে।
জ. সারের কার্যকারীতা বৃদ্ধি করে

চুনের প্রকারভেদ ঃ
বাজারে বিভিন্ন ধরনের চুন পাওয়া যায়। নিম্নে সারণীতে বিভিন্ন ধরনের চুনের প্রাপ্যতা ও রাসায়নিক গঠন উল্লেখ করা হলো-

চুনের নাম	প্রাপ্যতা
পাথুরে চুন	বাজারে পাওয়া যায়
পোড়া চুন	বাজারে পাওয়া যায়
কলি চুন	বাজারে পাওয়া যায়
ডলোমাইট	বাজারে পাওয়া যায়
জীপসাম	বাজারে পাওয়া যায়

চুনের মাত্রা ঃ
সাধারণভাবে প্রতি শতকে এক কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। চুন প্রয়োগের জন্য প্রথমেই জানতে হবে পানিতে P^H এবং ক্ষারত্বের পরিমাণ। পকুর ব্যবস্থাপনায় পুকুরে উৎপাদনশীলতা অনেকাংশে নির্ভর করে পানির অম্- ত্ব/ক্ষারত্বের ওপর।

চুনের প্রয়োগের মাত্রা ঃ
মাটির P^H ও চুনের ধরনের ওপর নির্ভর করেই চুনের মাত্রা নির্ধারণ করা উচিত। যখন শুধুমাত্র P^H-কে বিবেচনা করে চুনের মাত্রা নির্ধারণ করা হয় সে ক্ষেত্রে পোড়া চুন, পাথুরে চুনের চেয়ে দ্বিগুণ ও কলি চুন থেকে দেড়গুণ শক্তিশালী ধরে মাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

মাটির ধরণ অনুযায়ী পোড়া চুনের প্রতি শতাংশ প্রয়োগ মাত্রা উল্লেখ করা হলো-

মাটির ধরণ	নতুন পুকুর	পুরাতন পুকুর
দো-আশ	১ কেজি	২ কেজি
এটেল	৪ কেজি	৬ কেজি

প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ
শুকনা ও ভেজা মাটির পুকুরে প্রস্তুতকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় চুন গুড়া করে ঢালসহ সমস্ত জায়গায় সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। পানি ভর্তি পুকুরে প্রয়োজনীয় চুন মাটির চাড়ি বা ড্রামে গুলে ঢাল সহ সমস্ত পুকুরে পূর্বের মত সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

চুন প্রয়োগের সময় ঃ
শুকনা পুকুরে চাষ দেয়ার ১-২ দিন পর
পুকুরে পানি সেচেরে পর পরই ভেজা মাটিতে
পানি ভর্তি পুকুরে সার প্রয়োগের ৬-৭ দিন আগে।

চুন প্রয়োগের সতর্কতা ঃ

- চুন গুলানো ও ছিটানোর সময় নাক ও মুখ গামছা দিয়ে বাঁধতে হবে
- কোন অবস্থাতেই প্লাষ্টিকের পাত্রে চুন গুলানো যাবে না

- চুনের পাত্রে পানি ঢালার আগে পাত্রের মুখ অবশ্যই চট/বস্তা দিয়ে ঢাকতে হবে
- পাত্রে চুন রেখে তার পর পানি ঢালতে হবে
- বাতাসের অনুকূলে চুন ছিটাতে হবে
- চোখে চুন লাগলে সাথে সাথে তা পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

অধিবেশনঃ-৪

পুকুর প্রস্তুতকালীণ সময়ে সার প্রয়োগ

জলজ পরিবেশে বিদ্যমান উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহ খাদ্যের জন্য পারস্পরিক ভাবে একে অন্যের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। যার ফলে পুকুর সব সময়ই পুষ্টি পদার্থের একটি গতিশীল চক্রায়ন ঘটতে থাকে। পুষ্টি পদার্থের এই গতিশীল চক্রায়নই খাদ্য শিকল নামে অভিহিত। যেহেতু এই চক্রের একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ হচ্ছে মৃত প্রাণী বা জৈব পদার্থের পচনের মাধ্যমে অজৈব পুষ্টি মুক্তকরণ।

পুকুরের পরিবেশে বিদ্যমান খাদ্য চক্রের প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছে ফাইটোপ্লাংটন, ব্যাকটেরিয়া, জলজ উদ্ভিদ, প্রাণী-প্লাংকটন, তলদেশে ছোট পোকা-মাকড়, মাছ ইত্যাদি। এরা সকলেই উৎপাদন ও গ্রহণে সম্পৃক্ত তাই এদেরকে উৎপাদক ও গ্রাহক বলা হয়। এই উৎপাদক ও গ্রাহকসমূহ খাদ্য শিকলের তিনটি স্তরে অবস্থান করে। যেমন-
প্রথম স্তরে ঃ প্রাথমিক উৎপাদক (উদ্ভিদপ্লাংকটন, ব্যাকটেরিয়া)
দ্বিতীয় স্তর ঃ প্রাথমিক পর্যায়ের গ্রাহক (প্রাণী-প্লকটন, তৃণভোজী মাছ)
তৃতীয় স্তরঃ দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রাহক (প্রাণী-প্লাংকটন ভোজী মাছ ও মাংসাসী প্রাণী)
খাদ্য শিকলের প্রথম স্তর শুরু হয় প্রাথমিক উৎপাদক; ফাইটো-প্লাংকটন দিয়ে। এরা সূর্যশক্তিকে অজৈব কার্বনের সাথে সংযুক্ত করে প্রটোপ্লাজম, শ্বেতসার ও অক্সিজেন তৈরি করে।
খাদ্য শিকলের পরের স্তরে অবস্থানকারী প্রাথমিক পর্যায়ের গ্রাহক মূলতঃ প্রাণী-প্লাংকটন। প্রাণী প্লাংকটন খাদ্যের জন্য প্রাথমিক স্তরে উৎপাদিত উদ্ভিদপ্লাংকটন ও ব্যাকটোরিয়ার ওপর নির্ভরশীল। কিছু তৃণভোজী মাছও এ স্তরে অবস্থান করে উদ্ভিদপ্লাংকটন খেয়ে থাকে। একইভাবে তৃতীয় স্তরে অবস্থানকারী মাছ খাদ্যের জন্য উদ্ভিদপ্লাকটন ও প্রাণী-প্লাংকটনের ওপর নির্ভরশীল থাকে যারা আবার চূড়ান্তভাবে বড় রাক্ষুসে মাছের শিকার পরিণত হয়। অন্যদিকে পুকুরে বসবাসকারী প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ এবং মৃত্যুর পর উদ্ভিদ ও প্রাণী তলদেশে জমা হয়। তখন বিশেষ ধরনের কিছু ব্যাকটেরিয়া এবং ফাংগাস সমস্ত বস্তুর পচন ঘটিয়ে অজৈব পুষ্টি মুক্ত করে যা পুনরায় উদ্ভিদপ্লাংকটন উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। পচনকারী প্রাণীদের খায় প্রটোজোয়া, একজাতীয় কেঁচো। উল্লেখিত উদ্ভিদপ্লাংকটন, প্রাণী-প্লাংকটন, উদ্ভিদ, প্রটোজোয়া, কেঁচো এদের সকলকে একসাথে বলে পুকুরের জৈব উৎপাদন।

সার প্রয়োগের উদ্দেশ্যঃ

পোনা বা মাছ- এর প্রাকৃতিক খাবার হলো প্রধানত উদ্ভিদ প্লাংকটন ও প্রানিপ্লাংকটন। প্রাণি-প্লাংকটন এর উৎপাদন নির্ভর করে উদ্ভিদপ্লাংকটনের প্রাচুর্যতার ওপর। আর উদ্ভিদপ্লাংকটন তাদের বাঁচার জন্য দ্রবীভূত পুষ্টির উপর নির্ভরশীল। প্লাংকটন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও সালফার। এরা প্রটোপ্লাজমের মূল উপাদান। আমিষ এবং নিউক্লিক এসিড সংশ্লেষণে এদের প্রয়োজন। প্রাকৃতিকভাবে বিভিন্ন উৎস হতে এই পুষ্টিসমূহ পানিতে দ্রবীভূত হয়।তবে এদের মধ্যে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস প্রকৃতিকভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানিতে দ্রবীভূত হয় না। যখন নার্সারি পুকুরে পোনা মজুদ করা হয় তখন অধিক পরিমাণে প্লাংকটন উৎপাদনের প্রয়োজন হয়। সে সময় পানিতে দ্রবীভূত নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের ঘাটতি দেখা দেয়। পুষ্টি উপাদানের এই ঘাটতি পুরণের জন্য পুকুরে বিশেষভাবে নাইট্রোজেনের উৎস হিসেবে ইউরিয়া এবং ফসফরাসের উৎস হিসেবে টিএসপি সার প্রয়োগ করা হয়। এক কথায় বলা যায় পোনার প্রাকৃতিক খাদ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যই পুকুরে পানিতে সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

সারের প্রকারভেদ ঃ

জৈব ও অজৈব দু'ধরনের সার-ই পুকুরে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

জৈব সার ঃ

সরাসরি প্রাণী-প্লাংকটন এবং ব্যাকটেরিয়ার খাদ্য হিসেবে কাজ করে। পানিতে অজৈব পুষ্টি মুক্ত করে উদ্ভিদপ্লাংকটন উৎপাদনে সাহায্য করে। পুকুরে জৈব সার হিসেবে গোবর, হাঁস মুরগীর বিষ্ঠা বা কম্পোষ্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।

অজৈব সার ঃ

প্রাথমিকভাবে ফাইটো-প্লাংকটন উৎপাদনে সহায়ক। অজৈব সার হিসেবে প্রধানতঃ ইউরিয়া ও টিএসপি ব্যবহার করা হয়।

জৈব ও অজৈব সার ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা ঃ

জৈব সারের সুবিধা ঃ

- সরাসরি প্লাংকটন ও ব্যাক্টেরিয়ার খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়
- বেলে ও দোঁ-আশ মাটির পুকুরে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে
- মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়
- স্থানীয়ভাবে কম খরচে/বিনা খরচে পাওয়া যায়
- পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম বা নাই
- প্লাংকটনের বৃদ্ধির জন্য কমবেশি সব ধরনের পুষ্টিবিদ্যমান
- সারের আঁশ ব্যাকটেরিয়ার আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে।

জৈব সারের অসুবিধা ঃ

- পরজীবী ও রোগের বাহকের জন্য দায়ী থাকে
- যৌগ পদার্থ হওয়ার কারণে দেরীতে ফলাফল পাওয়া যায়
- তলায় জমা হয়ে বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি করতে পারে
- অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয় বলে প্রয়োগ পদ্ধতি কিছুটা জটিল
- ক্ষেত্র বিশেষে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়।

অজৈব সারের সুবিধা ঃ

- দ্রুত কার্যকর
- বাজারে সহজ প্রাপ্য
- নির্দিষ্ট মাত্রার পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ
- প্রয়োগ পদ্ধতি সহজ।

অজৈব সারের অসুবিধাঃ

- কার্যকারীতা ক্ষণস্থায়ী
- মাটির গঠন শক্ত হয়ে যায়
- মাটির অনুজীবের কার্যকারীতা কমে যায়
- বহুদিন ধরে ব্যবহার করলে আস্তে আস্তে পুকুরের উৎপাদনশীলতা কমে যায়
- পরিমিত ব্যবহার রোগের আক্রমণ বৃদ্ধি পায়।

সার প্রয়োগের মাত্রা ঃ

পুকুরে সার প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মজুদকৃত মাছের প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদন। পর্যাপ্ত প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য একটি পুকুরে কি পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হবে তা অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যেমন-

১. মাটির অবস্থা
২. পানির মধ্যকার শেওলার পুষ্টি চাহিদা
৩. পরিবেশের অবস্থা (তাপমাত্রা, মেঘ-বৃষ্টি)
৪. সারের গুণাগুণ

৫. সারের প্রাপ্যতা।

এছাড়াও পুকুরের উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে চাষির অভিজ্ঞাতও সারের প্রয়োগ মাত্রা নির্ধারণে অত্যন্তগুরুত্বপুর্ণ। সাধারণভাবে একটি নার্সারি পুকুরে প্রস্তুতকালীণ সারের সুপারিশকৃত মাত্রা নিম্নরূপ-

সার	প্রয়োগমাত্রা/শতাংশ
গোবর কম্পোষ্ট	৫-৭ কেজি ৮-১০কেজি
অজৈব সার ইউরিয়া	১০০-১৫০ গ্রাম
টিএসপি	৫০-৭৫ গ্রাম

টি এস পি সারের পরিবর্তে ডিএপি সার ব্যবহার করলে ইউরিয়ার প্রয়োগ মাত্রা অর্ধেক হবে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

শুকনা পুকুরঃ প্রয়োজনীয় জৈব সার সমান ভাবে তলায় ছড়িয়ে দেয়ার পর চাষ দিয়ে ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। তবে শুকানোর পর তলায় একটি গর্ত কুড়লে যদি দেখা যায় মাটি হতে অতিরিক্ত লাল কষ বের হয় তবে চাষ না দেয়াই ভাল। প্রয়োজনে উপরে উল্লেখিত মাত্রার জৈব সারের সাথে কিছু সরিষার খৈল (০.৫ কেজি/শতাংশ) মিশিয়ে দেয়া যায়। পানি ভরাটের পর টিএসপি সার ১২-২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছিটানোর পূর্বে ইউরিয়ার সাথে একত্রে পানিতে গুলে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

পানি ভর্তি পুকুর ঃ টিএসপি ও গোবর সার একত্রে একটি বালতি বা ড্রামের মধ্যে তিনগুণ পানিতে ১২-২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। প্রয়োগের পূর্বে উহাদের সাথে ইউরিয়া মিশিয়ে সমানভাবে সারা পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। তবে পুকুরের আয়তন খুব বড় হলে জৈব সার পানিতে গুলে প্রয়োগ করা বেশ অসুবিধাজনক। সে ক্ষেত্রে জৈব সার শুকনা অবস্থায় সতর্কতার সাথে সমানভাবে ছিটিয়ে দেয়া যেতে পারে।

সার প্রয়োগের সময় ঃ চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর এবং রেণু মজুদের ৮-১০ দিন আগে পুকুরে প্রুস্তুতকালীন সার প্রয়োগ করতে হবে। দিনের যে কোন সময় সার প্রয়োগ করা যায়। তবে, সাধারণতঃ সূর্যোলোক পড়ার পর সার প্রয়োগ করাই উত্তম। এ সময়টি সকাল থেকে দুপুরের মধ্যেই নির্ধারণ করা উচিত।

সার প্রয়োগে সতর্কতা ঃ

- মিশ্র সার ব্যবহারের পূর্বে পরিমিত পানিতে খুব ভালভবে গুলে নিলে কার্যকারিতা কমে যায়
- মেঘলা দিন বা বৃষ্টির মধ্যে সার প্রয়োগ করলে কার্যকারিতা কম হয়ে থাকে।
- ইউরিয়া সার বাতাসে খোলা অবস্থায় রাখলে কার্যকারিতা কমে যায়।
- পানিতে জলজ উদ্ভিদ থাকলে সারের কার্যকারীতা কম হয়। কারণ পুষ্টিকর পদার্থ উদ্ভিদ প্লাংকটনের চেয়ে আগাছাই বেশি গ্রহণ করে থাকে।

অধিবেশনঃ-৫

পুকুরের পোনা ছাড়ার উপযোগী পরিবেশ ও প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যবেক্ষণ এবং পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা ও প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা

- পানিতে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাবার আছে কি না তা জানা
- পুকুরের পরিবেশ পোনা ছাড়ার উপযোগী কিনা তা জানা
- পুকুরে আরও সার প্রয়োগ করতে হবে কিনা তা জানা।

প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষার পদ্ধতি ঃ

পুকুরে পোনা প্রাকৃতিক খাদ্য আছে কিনা তা প্রথমেই খালি চোখে পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে পানির রং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বুঝে নিতে হবে। এছাড়াও নিম্নলিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে করা যেতে পারে।

১. সেকিডিস্ক পদ্ধতি ঃ
সেকিডিস্ক একটি লোহার চাকতি বিশেষ। এর ব্যাস ২০ সে.মি., রং সাদা ও কালো। এটি তিন রংয়ের একটি সুতা দ্বারা ঝুলানো থাকে। গোড়া থেকে প্রথম ২০সে.মি. লাল, দ্বিতীয় ১০ সে.মি. সবুজ এবং বাকী অংশ সাদা (১০০-১২০ সে.মি.)

ব্যবহার কৌশল ঃ পানিতে লাল সুতা পর্যন্ত ডুবানোর পর সেকিডিস্কের সাদা কালো অংশ দেখা না গেলে বুঝতে হবে পুকুরে অতিরিক্ত খাদ্য আছে। তবে পানি ঘোলা থাকলেও এ অবস্থা হতে পারে। এ অবস্থা পুকুরে পোনা ছাড়া যাবে না। পানিতে সবুজ সুতা পর্যন্ত ডুবানোর পর তলার সাদা অংশ দেখা না গেলে বুঝতে হবে পানিতে পরিমিত খাদ্য আছে।

ব্যবহারের সময় ঃ
এটি ব্যবহার করতে হবে প্রস্তুতকালীন সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর সকাল ১০-১১ টায়। সূর্যের অবস্থানের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এটি ব্যবহার করা উচিত।

সতর্কতা ঃ
- একই ব্যক্তি একই স্থানে একই সময় খাদ্য পরিমাপ করবে
- ঘোলা পানিতে বা মেঘাচ্ছন্ন দিনে সেকিডিস্ক ব্যবহার করা যাবে না
- সেকিডিস্ক রিডিং সঠিকভাবে নিতে হবে
- সেকিডিস্কের লাল ও সবুজ সুতার দৈর্ঘ্য সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হবে।

গামছা গ্লাস পদ্ধতি ঃ
পুকুর প্রস্তুতকালীণ সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর গামছার সাহায্যে পানি সংগ্রহ করে পরিষ্কার কাঁচের গ্লাসে নিতে হবে। সূর্যের আলোতে যদি গ্লাসের মধ্যে সবুজ কণা, ক্ষুদ্র প্রাণীকণা (গ্লাস প্রতি ৫-১০) দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে প্রাকৃতিক খাদ্য আছে।
সতর্কতা ঃ
- অস্বচ্ছ, রঙ্গিন বা ছাপমারা গ্লাস ব্যবহার করা যাবে না।
- ঘোলা পানিতে ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে না।

হাত পদ্ধতি ঃ
নিজের হাত কনুই পর্যন্ত পানিতে ডুবানোর পর, হাতের তালু/পাতা দেখতে হবে। পানির রং সবুজাভ থাকলে এবং হাতের তালু দেখা না গেলে বুঝতে হবে পরিমিত খাদ্য আছে। সূর্যালোকিত দিনে সকাল ১০-১১ টায় এ পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে।

সতর্কতা ঃ
- ঘোলা পানিতে ফলাফল আসবে না
- ছোট হাত ব্যবহার করা যাবে না
- হাতের তালু ফর্সা হতে হবে
- একই ব্যক্তিকে একই স্থানে প্রতিবার পরীক্ষা করতে হবে।

পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা ঃ
পানির বিষাক্ততা হচ্ছে পানির এমন এক বিশেষ অবস্থা যা পুকুরে মজুদ করা রেণু বেঁচে থাকার জন্য প্রতিকুল অবস্থার সৃষ্টি করে। পানিতে বিদ্যমান বিষাক্ত পদার্থ রক্ত কণিকার সাথে বিক্রিয়া করে, ফুলকার উপর জমা হয়ে শ্বাস প্রশ্বাসে

বাঁধা সৃষ্টি করে। এর ফলে পোনা মারা যেতে পারে। পানির বিষাক্ততা পরীক্ষার কাজটি পোনা ক্রয়ের দিনক্ষণ ঠিক করার পূর্বেই করতে হবে।

পানিতে বিষাক্ততার উৎস ঃ

পুকুরের পানিতে বিষাক্ততার একাধিক উৎস থাকতে পারে, যেমন-

- পুকুরের ঔষধ প্রয়োগ
- জলজ পোকা-মাকড় দমনে প্রয়োগকৃত কীটনাশক
- তলায় পুঞ্জিভূত অতিরিক্ত জৈব পদার্থের পচন।

পানির বিষাক্ততা পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা ঃ

রাক্ষুসে ও বাজে মাছ দূর করার জন্য সাধারণতঃ যে সব ঔষধ ও বিষ ব্যবহার করা হয় তাদের বিষাক্ততার মেয়াদকাল ৭-৩০দিন পর্যন্ত হতে পারে। বিষাক্ততার মেয়াদকাল শেষ হওয়ার পূর্বেই যদি পুকুরে পোনা মজুদ করা হয় তবে এরা ব্যাপক হারে মারা যাবে। তাই পোনার বেঁচে থাকা নিশ্চিত করার জন্য মজুদ করার পূর্বেই পুকুরের পানিতে বিষাক্ততা আছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন।

পানির বিষাক্ততা পরীক্ষার সময় ঃ

মজুদ করার ১-২ দিন পূর্বে পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা করে নেয়া উচিত।

পানির বিষাক্ততা পরীক্ষার পদ্ধতি ঃ

যে পুকুরে পোনা মজুদ করা হবে তার পানি একটি বালতি বা ডেকচির মধ্যে নিয়ে পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা করা যায়। এজন্য দুটো ডেকচি একটিতে পোনা ছাড়ার পুকুরের পানি এবং অন্যটিতে টিউবলের পানি নিতে হবে। ডেকচি দুটিতে অল্প কিছু পোনা ছেড়ে তিন-চার ঘন্টা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি সবগুলো পোনা বেঁচে থাকে তাহলে বুঝতে হবে পানির বিষাক্ততা নেই।

অধিবেশনঃ-৬

পোনার জাত, মজুদ ঘনত্ব ও অনুপাত নির্ধারণ

প্রজাতি নির্বাচন

প্রজাতি নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়:

- পুকুরে সব স্তরের খাদ্যের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- চাষকৃত মাছ যাতে একে অন্যের সাথে খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য প্রতিযোগিতা না করে।
- নির্বাচিত প্রজাতিগুলোর পোনা নিজ এলাকায় অথবা এলাকার কাছাকাছি পাওয়া যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।
- প্রজাতিগুলোর স্বভাব যেন রাক্ষুসে না হয় ।
- সাধারণভাবে রোগ প্রতিরোধে সক্ষম।
- এলাকাগত চাহিদা ও বাজরদর ভাল হতে হবে।
- মাছগুলোর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সহজ হতে হবে।
- প্রজাতিগুলো হবে দ্রত বর্ধনশীল।

মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ:

মজুদ ঘনত্ব নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উপর নির্ভরশীল:

- চাষ পদ্ধতি
- পোনার আকার
- খাদ্যের পর্যাপ্ততা

- পানি পরিবর্তনের সুযোগ
- অক্সিজেন সরবরাহের সুযোগ

অধিক মজুদ ঘনত্বের কুফল:

- মাছের খাদ্য ও বাসস্থান নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়।
- পানির গুণাগুণ স্বাভাবিক রাখা সম্ভবপর হয়না।
- মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাঁধাগ্রস্থ হয়।
- মোট উৎপাদন কমে যায়।
- বিভিন্ন ধরণের রোগের প্রদূর্ভাব দেখা যায়।
- পানির ঘোলাত্ব বেড়ে যায়।
- খাদ্য শিকল ও পুষ্টি চক্র ভেঙ্গে যায়।
- পানিতে অক্সিজেনের মাত্রার ব্যাপক তারতম্য ঘটে।
- মাছের স্বাভাবিক চলাফেরা বিঘ্নিত হয়।

প্রজাতি নির্বাচন ও শতাংশ প্রতি মজুদ ঘনত্বের হার নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	প্রজাতি	
০১ :	মনোসেক্স তেলাপিয়া	২০০-২৫০
মোট		২০০-২৫০

অধিবেশনঃ-৭

পুকুরের মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ পদ্ধতি

আমাদের দেশে প্রচুর মনোসেক্স তেলাপিয়া উৎপাদন করতে পারলে বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যাবে। আশার কথা যে, মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষে এখন অনেকেই উৎসাহিত হচ্ছেন। তবে পরিকল্পিত উপায়ে মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ করলে খামারীরা অবশ্যই লাভবান হবেন। সাম্প্রতিক বছর গুলোতে দেশের বিভিন্ন অংশে বেশ কিছু মনোসেক্স তেলাপিয়া হ্যাচারি গড়ে উঠেছে। এ সব হ্যাচারিগুলোতে উৎপাদিত পোনা সারা দেশে সরবরাহ করা হচ্ছে। ব্যাপারটি ইতিবাচক তবে আবার আশংকাজনক ও বটে। কেননা অনেক হ্যাচারিই ছোট ব্রুড (Brood) থেকে বা অনুপযুক্ত ব্রুড থেকে পোনা উৎপাদন করার কারণে খামারী অনেক সময় সফল হবার পরিবর্তে প্রতারিত হয়ে থাকেন (এ ব্যপারটি অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে)। কয়েক বছর যাবত আমদানিকারকরা সরাসরি থাইল্যান্ড থেকে পোনা আমদানি করে তা খামারীদের সরবরাহ করছে। দেশি পোনার চেয়ে থাইল্যান্ডের পোনায় অধিক ফলন পাওয়া গেছে। তবে বিদেশ থেকে সব সময় পোনা আমদানি উৎসাহিত করা উচিত নয় এতে রোগেরও আমদানি ঘটতে পারে। নির্দিষ্ট নীতিমালা এবং মানরক্ষা করে দেশে আধুনিক হ্যাচারিতে উন্নত পোনা উৎপাদনকে উৎসাহিত করা উচিত।

মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষের ক্ষেত্রে সুষম খাবার একটি অন্যতম প্রধান শর্ত, খামার ব্যবস্থাপনায় খাবারেই অধিক অর্থ ব্যয় হয়। বর্তমানে দেশে কয়েকটি কোম্পানী মনোসেক্স তেলাপিয়ার জন্য আধুনিক খাবার তৈরি করছে। এ সব কোম্পানীর প্রস্তুতকৃত সুষম খাবার খামারীরা সহজেই পেতে পারে। মনোসেক্স তেলাপিয়ার জন্য সুষম খাবার প্রাপ্তি মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ প্রসারের জন্য একটি ইতিবাচক দিক বটে।

মনোসেক্স তেলাপিয়া সুস্বাদু মাছ বলে এ মাছের বাজার চাহিদা প্রচুর, তাছাড়া পোনা সরবরাহ করা গেলে পুকুরে বছরে দুই বার চাষ করে অধিক লাভবান হওয়া যায়। সঠিক চাষ ব্যবস্থাপনায় মনোসেক্স তেলাপিয়া ৪ মাসে গড়ে ২৫০-৩০০ গ্রাম হয়ে থাকে।

মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পরিকল্পিত মনোসেক্স তেলাপিয়া খামার করলে খামারীরা উপকৃত হবেন এবং দেশে অর্থনীতিতে ও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষের সুবিধা সমূহ

- মনোসেক্স তেলাপিয়া অপেক্ষাকৃত প্রতিকূল পরিবেশে (স্বল্প অক্সিজেন, P^H, ঘোলাত্বের তারতম্য ইত্যাদি) বেঁচে থাকতে পারে এবং দৈহিক বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে
- শিকারী মাছ নয় বলে কার্পজাতীয় মাছের সাথে মনোসেক্স তেলাপিয়া মিশ্রচাষ করা যায়
- সনাতন পদ্ধতি, উন্নতপদ্ধতি এবং নিবিড় পদ্ধতিতে এ মাছ চাষ করা সম্ভব
- আমাদের পাশে পাশে ডোবা পুকুর এবং দীঘিতেও **মনোসেক্স তেলাপিয়া** চাষ করা যায়
- মিঠাপানি এবং স্বল্পলোনা পানিতে মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ করা যায়
- দ্রুত বর্ধনশীল হবার কারণে স্বল্প জায়গা ও অল্প সময়ে অধিক উৎপাদন করা যায়
- খেতে সুস্বাদু বলে বাজার মূল্য এবং চাহিদা প্রচুর
- মাছটির রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি
- মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছ বিদেশে রফতানি যোগ্য

মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ একাধিক পদ্ধতিতে করা যায়। অবকাঠামোগত সুবিধা, স্থান এবং পুঁজির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন চাষ পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়।
ক) একক চাষ, খ) মিশ্র চাষ গ) সমন্বিত চাষ, ঘ) খাঁচায় চাষ

মিশ্র চাষঃ আমাদের দেশে মাছ চাষ বলতে সাধারণত মিশ্র চাষকে বোঝাতো, কিন্তু সম্প্রতি মিশ্র চাষ ছাড়াও একক চাষ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। মিশ্র চাষে মূলত একই সাথে বিভিন্ন প্রজতির মাছের চাষ করা হয়। মনোসেক্স তেলাপিয়া অন্য প্রজাতির সাথে মিশ্র চাষ করা সম্ভব। মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রজাতির বৈশিষ্ট্য, খাদ্য চাহিদা, চাষের মেয়াদকাল প্রভৃতি বিষয় বিবেচনায় আনা হয়। যে সব প্রজাতির খাদ্যের জন্য একই স্তরে প্রতিযোগিতা করে না সে সব প্রজাতি মিশ্রচাষের আওতায় আনা যায়। মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছের খাদ্যস্তরে কোন রকম খাবারের প্রতিযোগিতায় যাবে না এমন প্রজাতির (কাতলা, সিলভার কার্প প্রভৃতি) মাছ মিশ্রচাষের আওতায় আনা যায়।

চাষ ব্যবস্থাপনার ধরন বিবেচনা করলে মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষে কয়েকটি পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়। পদ্ধতি গুলো হচ্ছে:
ক) ব্যাপক চাষ পদ্ধতি খ) উন্নতব্যাপক চাষ পদ্ধতি গ) আধা-নিবিড় চাষ পদ্ধতি ঘ) নিবিড় চাষ পদ্ধতি
আধা-নিবিড় চাষ পদ্ধতিঃ মাছ চাষের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি বেশ উন্নত। পুকুরের আয়তন ৩০-৫০ শতাংশ, পুকুরের তলদেশ সমান, পানি সরবরাহ এবং নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকে। পোনা বেশি মজুদ (২০০-৩০০/ শতাংশ) করা যায়, সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করতে হয় । পানির গুণাগুণ রক্ষা করার ব্যাপারটি এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এধরণের মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষে ৪ মাসে প্রতিটি মনোসেক্স তেলাপিয়া ওজন গড়ে ২৫০-৩০০ গ্রাম হয়ে থাকে।

অধিবেশনঃ-৮

পোণা পরিবহন, অভ্যস্থকরণ ও পুকুরে অবমুক্তকরণ

পোনা পরিবহণ ঃ

পোনা পরিবহণের গুরুত্ব ঃ

মাছ চাষের জন্য হ্যাচারি বা নার্সারি অথবা প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা সংগ্রহ করা হয়। পোনা মাছকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরকে পোনা পরিবহণ বলে। পোনা পরিবহণের উদ্দেশ্য হলো সুস্থ-সবল পোনা চাষির পুকুরে পৌঁছে দেয়া।

সঠিকভাবে পোনা পরিবহণ না করলে পোনা মজুদের সময় অথবা পোনা মজুদ করার পর প্রথম সপ্তাহেই অনেক পোনা মারা যায়। তাছাড়া মজুদের পর দুর্বল পোনা সহজেই রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্তহতে পারে। পরিবহণের সময় বা পোনা মজুদের পর মাছ মারা গেলে মাছ চাষে লাভ কমে যায়। পোনা পরিবহণের দক্ষতা বা সফলতা মাছচাষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সঠিকভাবে পোনা পরিবহণের উদ্দেশ্য হলো যত্নসহকারে পোনা পরিবহণের মাধ্যমে পোনার মৃত্যুর হার কমানো।

কী কী পদ্ধতিতে পোনা পরিবহণ করা হযে থকে-

আমাদের দেশে দুই পদ্ধতিতে পোণা পরিবহণ করা হয়ে থাকে। একটি সনাতন পদ্ধতি ও অন্যটি আধুনিক পদ্ধতি।

সনাতন পদ্ধতি ঃ সনাতন পদ্ধতিতে পোনা মাছ নার্সারি বা পোনা উৎপাদনের স্থান থেকে মাছচাষির পুকুরে পাতিল (মাটির বা এ্যালুমিনিয়াম), ড্রাম, নৌকায় পোনা পরিবহণ করে থাকে।

নৌকায় পোনা পরিবহণঃ মাছ চষের শুরু থেকেই আমাদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মৎস্যজীবীগণ ছোট ছোট নৌকার মাধ্যমে পোনা পরিবহণ করতেন। নৌকার তলায় কাদা দিয়ে বা কাদা ছাড়া পরিমাণমত পানি রেখে তাতে নদী থেকে পোনা ধরে নৌকার পানিতে রেখে দিতেন। নৌকার আয়তনের ওপর পোনার ঘনত্ব নির্ভর করে। দুরবর্তীস্থানে পোনা পরিবহণের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে নৌকার পানি পরিবর্তন করা হয়। বর্তমানে নৌকায় পোনা পরিবহণের খুব বেশি প্রচলন নেই। নৌকায় পোনা পরিবহণে পোনা মৃত্যুর হার অনেক কম।

পাতিলে পোনা পরিবহণ ঃ

- পাতিলে পোনা পরিবহণের ক্ষেত্রে মাটির বা এলুমিনিয়ামের পাতিল ব্যবহার করা হযে থাকে। তবে মাটির পাতিল তুলনামূলকভাবে ঠান্ডা থাকে বলে পোনা বেশি সতেজ/ভাল থকে।
- ২০ থেকে ৩০ লিটার পানি ধরে এমন পাতিলে প্রায় সম্পূর্ণ পানি ভর্তি করে ৩ থেকে ৫ সে.মি. আকারের ৫০০ হতে ১২০০টি টেকসই করা পোনা পরিবহণ করা যাবে।
- পোনা ভর্তি পাতিলের মুখ জাল বা পাতলা ভিজা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যাতে পোনা লাফিয়ে বের হতে না পারে।
- পোনা পরিবহণের সময় পাত্রের পানিতে বাতাস হতে অক্সিজেন মিশানোর জন্য পাতিল মাঝে মাঝে ঝাঁকি দিতে হবে বা পাতিলের ভিতরে পানি ছিটাতে হবে।
- পরিবহণকালে পোনার মল-মূত্র পচে অ্যামোনিয়া গ্যাসের সৃষ্টি করে যা মাছের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। সেজন্য দূরে পোনার পরিবহণের সময় দেড় ঘন্টা পর পর পাতিলের পানির তিন ভাগের দুই ভাগ ভাল পানি দ্বারা পরিবর্তন করতে হবে।
- পাতিলের মুখে ঢাকনা হিসেবে ছোট জাল বেঁধে জালের মাথায় একটি দড়ি লাগিয়ে হাত দিয়ে মাঝে মাঝে দড়ি উপরে-নিচে টেনে বাতাস থেকে পাতিলে অনবরত অক্সিজেন সরবরাহ করা যায়।
- সাধারণত পরিবহণকারী নিজের মাথায় একটি পাতিল বহণ করতে পারে। একটি বাঁশ বা কাঠের দুই পার্শ্বে দুইটি পাতিল বেধে কাঁধের দুইপার্শ্বে পাতিল দুইটি ঝুলিয়ে পরিবহণ করতে পারেন। তা'ছাড়া কোন যানবাহন, যেমন- রিক্সা, ভ্যান ইত্যাদির মাধ্যমে পোনার পাতিল পরিবহণ করা যায়।

ড্রামে পোনা পরিবহণ ঃ

লোহা বা প্লাষ্টিকের ড্রামে পাতিলের চেয়ে তুলনামূলকভাবে একসাথে অনেক বেশি পোনা অধিক দূরত্বে পরিবহণ করা যায়।

- ১৫০ লিটার পানি ধরে এমন ড্রামের তিন ভাগের দুই ভাগ ভাল পানি দ্বারা ভর্তি করে ২ থেকে ২.৫ সে.মি. আকারের ৮,০০০ থেকে ১০,০০০টি টেকসই করা মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছের পোনা পরিবহণ করা যায় অথবা ৫ থেকে ৭ সে. মি. আকারের ৬,০০০ থেকে ৮,০০০টি পোনা পরিবহণ করা যায়।
- পোনা পরিবহণের সময় পাত্রের পানিতে বাতাস হতে অক্সিজেন মিশানোর জন্য ড্রামের ভিতরে পানি ছিটাতে হবে বা হাত দিয়ে ড্রামের ঢাকনা হিসেবে ব্যবহৃত জাল বা কাপড় পানিতে নাড়াতে হবে। দূরে পোনা পরিবহণের সময় দুই ঘন্টা পর পর ড্রামের তিন ভাগের দুই ভাগ পানি ভাল পানি দ্বারা পরিবর্তন করতে হবে।
- ড্রামের পানিতে প্রতি ১০০ লিটার পানির জন্য ৩-৫ কেজি বরফ দেয়া যেতে পারে। এতে পানির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। ফলে পোনা বেশি সতেজ থাকে।
- ড্রাম ভর্তি পোনা রিক্সা, ভ্যান, ট্রাক, নৌকা ইত্যাদি যানবাহনের মাধ্যমে পরিবহন করা যায়।

আধুনিক পদ্ধতি ঃ

বর্তমানে সারা বিশ্বের মত আমাদের দেশেও আধুনিক পদ্ধতিতে পলিথিন ব্যাগে অক্সিজেন দিয়ে পোনা মাছ পরিবহণ করা হয়।

পলিথিন ব্যাগে পোনা পরিবহণের সুবিধাঃ

- ড্রাম বা পাতিলে পরিবহণকালে পাত্রের গায়ে ধাক্কা বা খোঁচা লেগে পোনার দেহে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু অক্সিজেনসহ পলিথিন ব্যাগে পোনা পরিবহণকালে পোনার শারীরিক ক্ষতির আশংকা থাকে না।
- সনাতন পদ্ধতিতে পাত্রের পানিতে অক্সিজেনের অভাব দেখা দিতে পারে। তাই সনাতন পদ্ধতি পোনা পরিবহনের ক্ষেত্রে নিরাপদ নয়। অপরদিকে অক্সিজেনসহ পলিথিন ব্যাগে সাধারণতঃ অক্সিজেনের অভাব ঘটে না।
- সনাতন পদ্ধতিতে পোনা পরিবহণ অধিক শ্রমনির্ভর কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে খুবই কম পরিশ্রমে পোনা পরিবণ করা যায়।
- সনাতন পদ্ধতি অত্যন্তঝুঁকিপূর্ণ, অপরদিকে আধুনিক পদ্ধতি খুবই নিরাপদ ও সুবিধাজনক।
- আধুনিক পদ্ধতিতে অনেক দূরবর্তী স্থানে সহজেই পোনা পরিবহণ করা সম্ভব।

পলিথিন ব্যাগে পোনা পরিবহণ পদ্ধতি ঃ

- পোনা মাছ পরিবহণের জন্য সাধারণতঃ ৮০ থেকে ৯০ সে.মি. লম্বা এবং ৫০ থেকে ৬০ সে.মি. চওড়া পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করা হয়।
- পলিথিন ব্যাগের চার ভাগের এক ভাগ ভাল পানি দিয়ে ভর্তি করে ঝাঁকি দিয়ে দেখতে হবে পলিথিন ব্যাগে কোন ছিদ্র আছে কিনা। পলিথিন ব্যাগে ছিদ্র থাকলে অক্সিজেন বের হয়ে পোনা মারা যাবে। সে কারণে ঝুঁকি এড়ানোর জন্য একটি পলিথিন ব্যাগ আরেকটি পলিথিন ব্যাগের ভিতর নিয়ে পোনা পরিবহণ করতে হবে।
- অক্সিজেনসহ ব্যাগের পানিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোনা দিতে হবে। পোনার ঘনত্ব নির্ভর করবে পোনার প্রজাতি, পোনার আকৃতি, পরিবহণের দূরত্ব ও আবহাওয়ার ওপর।
- পলিথিন ব্যাগে টেকসই করা পোনা দেওয়ার পর ব্যাগটিকে হালকা চাপ দিয়ে সংকুচিত করে তাতে অক্সিজেন সিলিন্ডারের পাইপটি পানির ভিতর ঢুকিয়ে পলিথিন ব্যাগের অবশিষ্ট চার ভাগের দুই ভাগ অক্সিজেন দ্বারা পূর্ণ করতে হবে।
- অক্সিজেন পূর্ণ করার পর ব্যাগটি চিকন সুতলি দিয়ে ভালভবে বেঁধে দিতে হবে।
- দূরবর্তী স্থানে পোনা পরিবহণ করতে হলে পলিথিন ব্যাগ চটের ভিজা ব্যাগে বা শক্ত কাগজের বাক্সে বা কার্টুনে ঢুকাতে হবে।

নিচের ছকে পলিথিন ব্যাগে পোনার ঘনত্ব দেখানো হলো ঃ

প্রজাতি	পোনার আকার/প্রকৃতি	পরিবহণ কাল/সময় (ঘন্টা)	পোনার সংখ্যা/লিটার পানি
মনোসেক্স তেলাপিয়া	৪ থেকে ৫ সে.মি.	সর্বোচ্চ ১০	২৫০ থেকে ৩০০টি

পরিবহণকালীণ সতর্কতা ঃ

- পোনা নাড়াচড়ার সময় পোনার দেহের পিচ্ছিলতা যেন চলে না যায়।
- সরাসরি পোনা হাত দিয়ে না ধরে জাল অথবা নরম কাপড় ব্যবহার করতে হবে।
- পরিবহণ পাত্র ভিজা কাপড় বা চট দ্বারা ঢেকে রাখতে হবে।
- পরিবহণকালে পাত্রের তাপমাত্রা কম রাখতে হবে। সেজন্য পরিবহণকালে পোনার পাত্র/ব্যাগ ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে।
- পাত্রের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত পোনা পরিবহণ করা যাবে না।
- বিভিন্ন আকারের ও প্রজাতির পোনা একত্রে পরিবহণ করা ভাল না।
- পলিথিন ব্যাগে যাতে টিনের কোনা, পেরেক বা অন্য কোন শক্ত বস্তুর আঘাত না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- পাতিল বা ড্রামে পরিবহণকালে পাত্রের পানি নাড়াচাড়া করতে হবে।
- মৃত পোনা সাথে সাথে পাতিল বা ড্রাম হতে অপসারণ করতে হবে।

অধিবেশনঃ-৯
মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগ

জলজ পরিবেশে বিদ্যমান উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহ খাদ্যের জন্য পারস্পরিক ভাবে একে অন্যের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। যার ফলে পুকুর সব সময়ই পুষ্টি পদার্থের একটি গতিশীল চক্রায়ন ঘটতে থাকে। পুষ্টি পদার্থের এই গতিশীল চক্রায়নই খাদ্য শিকল নামে অভিহিত। যেহেতু এই চক্রের একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ হচ্ছে মৃত প্রাণী বা জৈব পদার্থের পচনের মাধ্যমে অজৈব পুষ্টি মুক্তকরণ।

পুকুরের পরিবেশে বিদ্যমান খাদ্য চক্রের প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছে ফাইটোপ্লাংটন, ব্যাকটেরিয়া, জলজ উদ্ভিদ, প্রাণী-প্লাংকটন, তলদেশে ছোট পোকা-মাকড়, মাছ ইত্যাদি। এরা সকলেই উৎপাদন ও গ্রহণে সম্পৃক্ত তাই এদেরকে উৎপাদক ও গ্রাহক বলা হয়। এই উৎপাদক ও গ্রাহকসমূহ খাদ্য শিকলের তিনটি স্তরে অবস্থান করে। যেমন-

প্রথম স্তরে ঃ প্রাথমিক উৎপাদক (উদ্ভিদ প্লাংকটন, ব্যাকটেরিয়া)

দ্বিতীয় স্তর ঃ প্রাথমিক পর্যায়ের গ্রাহক (প্রাণী-প্লাংকটন, তৃণভোজী মাছ)

তৃতীয় স্তরঃ দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রাহক (প্রাণী-প্লাংকটন ভোজী মাছ ও মাংসাসী প্রাণী)

খাদ্য শিকলের প্রথম স্তর শুরু হয় প্রাথমিক উৎপাদক; ফাইটো-প্লাংকটন দিয়ে। এরা সূর্যশক্তিকে অজৈব কার্বনের সাথে সংযুক্ত করে প্রোটোপ্লাজম, শ্বেতসার ও অক্সিজেন তৈরি করে।

খাদ্য শিকলের পরের স্তরে অবস্থানকারী প্রাথমিক পর্যায়ের গ্রাহক মূলতঃ প্রাণী-প্লাংকটন। প্রাণী প্লাংকটন খাদ্যের জন্য প্রাথমিক স্তরে উৎপাদিত উদ্ভিদ প্লাংকটন ও ব্যাকটোরিয়ার ওপর নির্ভরশীল। কিছু তৃণভোজী মাছও এ স্তরে অবস্থান করে উদ্ভিদ প্লাংকটন খেয়ে থাকে। একইভাবে তৃতীয় স্তরে অবস্থানকারী মাছ খাদ্যের জন্য উদ্ভিদ প্লাকটন ও প্রাণী-প্লাংকটনের ওপর নির্ভরশীল থাকে যারা আবার চূড়ান্তভাবে বড় রাক্ষুসে মাছের শিকারে পরিণত হয়। অন্যদিকে পুকুরে বসবাসকারী প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ এবং মৃত্যুর পর উদ্ভিদ ও প্রাণী পুকুরের তলদেশে জমা হয়। তখন বিশেষ ধরনের কিছু ব্যাকটেরিয়া এবং ফাংগাস সমস্ত বস্তুর পচন ঘটিয়ে অজৈব পুষ্টি মুক্ত করে যা পুনরায় উদ্ভিদ প্লাংকটন উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। পচনকারী প্রাণীদের খায় প্রোটোজোয়া, একজাতীয় কেঁচো। উল্লেখিত উদ্ভিদ প্লাংকটন, প্রাণী-প্লাংকটন, উদ্ভিদ, প্রটোজোয়া, কেঁচো এদের সকলকে একসাথে বলে পুকুরের জৈব উৎপাদন।

সার প্রয়োগের উদ্দেশ্যঃ

মাছ- এর প্রাকৃতিক খাবার হলো প্রধানত উদ্ভিদ প্লাংকটন ও প্রানি প্লাংকটন। প্রাণি-প্লাংকটন এর উৎপাদন নির্ভর করে উদ্ভিদ প্লাংকটনের প্রাচুর্যতার ওপর। আর উদ্ভিদ প্লাংকটন তাদের বাঁচার জন্য দ্রবীভূত পুষ্টির উপর নির্ভরশীল। প্লাংকটন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি সমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও সালফার। এরা প্রোটোপ্লাজমের মূল উপাদান। আমিষ এবং নিউক্লিক এসিড সংশ্লেষণে এদের প্রয়োজন। প্রাকৃতিকভাবে বিভিন্ন উৎস হতে এই পুষ্টি সমূহ পানিতে দ্রবীভূত হয়।তবে এদের মধ্যে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস প্রকৃতিকভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানিতে দ্রবীভূত হয় না। যখন নার্সারি পুকুরে পোনা মজুদ করা হয় তখন অধিক পরিমাণে প্লাংকটন উৎপাদনের প্রয়োজন হয়। সে সময় পানিতে দ্রবীভূত নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের ঘাটতি দেখা দেয়। পুষ্টি উপাদানের এই ঘাটতি পুরণের জন্য পুকুরে বিশেষভাবে নাইট্রোজেনের উৎস হিসেবে ইউরিয়া এবং ফসফরাসের উৎস হিসেবে টিএসপি সার প্রয়োগ করা হয়। পোনার প্রাকৃতিক খাদ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই পুকুরে পানিতে সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

সারের প্রকারভেদ ঃ

জৈব ও অজৈব দু'ধরনের সারই পুকুরে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

জৈব সার ঃ

সরাসরি প্রাণী-প্লাংকটন এবং ব্যাকটেরিয়ার খাদ্য হিসেবে কাজ করে। পানিতে অজৈব পুষ্টি মুক্ত করে উদ্ভিদ প্লাংকটন উৎপাদনে সাহায্য করে। পুকুরে জৈব সার হিসেবে গোবর, হাঁস মুরগীর **বিষ্ঠা** বা কম্পোষ্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।

অজৈব সার ঃ

প্রাথমিকভাবে ফাইটো-প্লাংকটন উৎপাদনে সহায়ক। অজৈব সার হিসেবে প্রধানতঃ ইউরিয়া ও টিএসপি ব্যবহার করা হয়।

জৈব ও অজৈব সার ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা ঃ
জৈব সারের সুবিধা ঃ

- সরাসরি প্লাংকটন ও ব্যাক্টেরিয়ার খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়
- বেলে ও দোঁ-আশ মাটির পুকুরে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে
- মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়
- স্থানীয়ভাবে কম খরচে/বিনা খরচে পাওয়া যায়
- পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম বা নাই
- প্লাংকটনের বৃদ্ধির জন্য কমবেশি সব ধরনের পুষ্টিবিদ্যমান
- সারের আঁশ ব্যাকটেরিয়ার আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে।

জৈব সারের অসুবিধা ঃ

- পরজীবী ও রোগের বাহকের জন্য দায়ী থাকে
- যৌগ পদার্থ হওয়ার কারণে দেরীতে ফলাফল পাওয়া যায়
- তলায় জমা হয়ে বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি করতে পারে
- অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয় বলে প্রয়োগ পদ্ধতি কিছুটা জটিল
- ক্ষেত্র বিশেষে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়।

অজৈব সারের সুবিধা ঃ

- দ্রুত কার্যকর
- বাজারে সহজ প্রাপ্য
- নির্দিষ্ট মাত্রার পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ
- প্রয়োগ পদ্ধতি সহজ।

অজৈব সারের অসুবিধাঃ

- কার্যকারীতা ক্ষণস্থায়ী
- মাটির গঠন শক্ত হয়ে যায়
- মাটির অনুজীবের কার্যকারীতা কমে যায়
- বহুদিন ধরে ব্যবহার করলে আস্তে আস্তে পুকুরের উৎপাদনশীলতা কমে যায়
- পরিমিত ব্যবহার রোগের আক্রমণ বৃদ্ধি পায়।

সার প্রয়োগের মাত্রা ঃ
পুকুরে সার প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মজুদকৃত মাছের প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদন। পর্যাপ্ত প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য একটি পুকুরে কি পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হবে তা অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যেমন-

১. মাটির অবস্থা
২. পানির মধ্যকার শেওলার পুষ্টি চাহিদা
৩. পরিবেশের অবস্থা (তাপমাত্রা, মেঘ-বৃষ্টি)
৪. সারের গুণাগুণ
৫. সারের প্রাপ্যতা।

এছাড়াও পুকুরের উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে চাষির অভিজ্ঞাতও সারের প্রয়োগ মাত্রা নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। সাধারণভাবে একটি পুকুরে প্রস্তুতকালীণ সারের সুপারিশকৃত মাত্রা নিম্নরূপ-

সার	**প্রয়োগমাত্রা/শতাংশ**

গোবর	৫-৭ কেজি
অজৈব সার ইউরিয়া	১০০-১৫০ গ্রাম
টিএসপি	৫০-৭৫ গ্রাম

টি এস পি সারের পরিবর্তে ডিএপি সার ব্যবহার করলে ইউরিয়ার প্রয়োগ মাত্রা অর্ধেকের কিছু বেশি হবে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

শুকনা পুকুরঃ প্রয়োজনীয় জৈব সার সমান ভাবে তলায় ছড়িয়ে দেয়ার পর চাষ দিয়ে ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। তবে শুকানোর পর তলায় একটি গর্ত খুড়লে যদি দেখা যায় মাটি হতে অতিরিক্ত লাল কষ বের হয় তবে চাষ না দেয়াই ভাল। প্রয়োজনে উপরে উল্লেখিত মাত্রার জৈব সারের সাথে কিছু সরিষার খৈল (০.৫ কেজি/শতাংশ) মিশিয়ে দেয়া যায়। পানি ভরাটের পর টিএসপি সার ১২-২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছিটানোর পূর্বে ইউরিয়ার সাথে একত্রে পানিতে গুলে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

পানি ভর্তি পুকুর ঃ টিএসপি ও গোবর সার একত্রে একটি বালতি বা ড্রামের মধ্যে তিনগুণ পানিতে ১২-২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। প্রয়োগের পূর্বে উহাদের সাথে ইউরিয়া মিশিয়ে সমানভাবে সারা পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। তবে পুকুরের আয়তন খুব বড় হলে জৈব সার পানিতে গুলে প্রয়োগ করা বেশ অসুবিধাজনক। সে ক্ষেত্রে জৈব সার শুকনা অবস্থায় সতর্কতার সাথে সমানভাবে ছিটিয়ে দেয়া যেতে পারে।

সার প্রয়োগের সময় ঃ

চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর এবং রেণু মজুদের ৮-১০ দিন আগে নার্সারি পুকুরে প্রস্তুতকালীন সার প্রয়োগ করতে হবে। দিনের যে কোন সময় সার প্রয়োগ করা যায়। তবে সাধারণতঃ সূর্যোলোক পড়ার পর সার প্রয়োগ করাই উত্তম। এ সময়টি সকাল থেকে দুপুরের মধ্যেই নির্ধারণ করা উচিত।

সার প্রয়োগে সতর্কতা ঃ

- মিশ্র সার ব্যবহারের পূর্বে পরিমিত পানিতে খুব ভালভবে গুলে নিলে কার্যকারিতা কমে যায়
- মেঘলা দিন বা বৃষ্টির মধ্যে সার প্রয়োগ করলে কার্যকারিতা কম হয়ে থাকে।
- ইউরিয়া সার বাতাসে খোলা অবস্থায় রাখলে কার্যকারিতা কমে যায়।
- পানিতে জলজ উদ্ভিদ থাকলে সারের কার্যকারীতা কম হয়। কারণ পুষ্টিকর পদার্থ উদ্ভিদ প্লাংকটনের চেয়ে আগাছাই বেশি গ্রহণ করে থাকে।

অধিবেশনঃ-১০
মজুদ পরবর্তী সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ

সম্পূরক খাদ্য পরিচিতি ঃ

অন্যান্য জীবের মতো মাছের ও খাদ্যের প্রয়োজন। মাছের বৃদ্ধি, জীবন ধারন, প্রজনন এবং বংশ বৃদ্ধির জন্য খাদ্য অপরিহার্য। মাছ জলজ প্রাণী। এ কারণে স্বভাবতই পানি থেকে মাছ খাদ্য গ্রহণ করে। মাছ তার পর্যাপ্ত খাবার পেলে সুষ্ঠ ভাবে জীবন চক্র সম্পন্ন করতে পারে। প্রাকৃতিক পরিবেশে খাল বিল নদী নালায় মাছকে খাবার সরবরাহ না করলেও প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে মাছ তার প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে। সাধারণত প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে মাছ খাদ্য হিসেবে ফাইটোপ্লাংক্টন, জলজ কীট, প্রোটোজোয়া প্রভৃতি খেয়ে থাকে তবে পুকুরে পরিকল্পিত মাছ চাষে প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি মাছকে সম্পূরক খাবার সরবরাহ করা হয়ে থাকে। সম্পূরক খাবার উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ উভয় প্রকার হতে পারে। তবে সম্পূরক খাদ্য হিসেবে চালের কুঁড়া, গমের ভুষি, আটা, ময়দা, তিলের খৈল, সরিষার খৈল, সয়াবিনের খৈল, শুটকি মাছের গুড়া, মিট এন্ড বোন মিল, কুটি পাণা এমনকি হাঁস-মুরগি বা গরু-ছাগলের নাড়ি ভুড়ি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। পুকুরে ব্যবহার্য মাছের খাদ্যের মধ্যে আরো রয়েছে তরকারির খোসা, নরম সবুজ উদ্ভিদ, ক্ষুদিপানা, সুজিপানা, আলুপাতা, পেপে পাতা, কলা পাতা, ইপিল পাতা, শামুকের মাংস, পোকা মাকড়ের ডিম, কেঁচো, পশুর রক্ত প্রভৃতি। সম্পূরক খাবার হাতে তৈরী করে প্রয়োগ করা যায় আবার মেশিনে তৈরী করেও প্রয়োগ করা যায়।

সম্পূরক খাবার ঃ
প্রাকৃতিক উৎস থেকে মাছ যদি যথেষ্ট খাবার না পায় তখন তাকে বাইরে থেকে খাদ্য সরবরাহ করতে হয়, কেননা মাছের প্রয়োজনীয় খাবারের অভাব হলে বৃদ্ধি এবং প্রজনন সব ক্ষেত্রেই বাধাগ্রস্থ হবে। প্রাকৃতিক খাবারের বিকল্প যে খাবার বাইরে থেকে সরবরাহ করা হয় তাকে সম্পূরক খাবার বলা হয়ে থাকে।
সম্পূরক খাবারের গুরুত্ব ঃ
সুষম ভাবে প্রস্তুত কৃত সম্পূরক খাবারের গুরুত্ব অপরিসীম। এতে যে সব সুবিধা পাওয়া যায় সে গুলো হচ্ছে

- অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায়
- কৃত্রিম খাদ্যে পুষ্টি বিরোধী উপাদান বাদ দেয়া যায়
- খাদ্য রূপান্তর হার আকর্ষনীয় হয়
- পোনা বাচাঁর হার বেড়ে যায়
- পুষ্টির অভাব জনিত রোগ থেকে মুক্তি পায়
- মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
- খাবারের সাথে প্রয়োজনীয় ঔষধ মেশানো যায়
- পানির গুণাগুন রক্ষা করে মাছের সুষম বৃদ্ধি হয়
- কম সময়ে অধিক মুনাফা পাওয়া যায়
- নির্দিষ্ট সময়ে অধিক ফলন নিশ্চিত করে

সম্পূরক খাদ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়ঃ
সম্পূরক খাদ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে কতগুলো বিষয় বিবেচনা করা হয়। বিবেচ্য বিষয় গুলো হচ্ছে

- মাছের খাদ্যাভ্যাস
- মাছের বয়স, আকার ও আকৃতি
- মাছের প্রজাতি
- মাছের দৈহিক ওজন
- প্রাকৃতিক খাবারের পরিমাণ
- মাছের ঘনত্ব
- খাবারের গুগত মান
- মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার ধরন
- খাদ্য রূপান্তর হার
- পানির রং এবং তাপমাত্রা

সম্পুরক খাবারের বৈশিষ্টাবলী
পুকুরে প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি বাইরে থেকে যে খাবার প্রয়োগ করা হয় তা সম্পূরক খাবার। সম্পূরক খাবারের ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকবে যেমনঃ-

- খাদ্য উপাদান পুষ্টিমান সম্পন্ন হতে হবে
- খাবার পঁচা, বাশি বা দূর্গন্ধযুক্ত হবে না
- খাবার অবশ্যই সুষম মানের হতে হবে
- খাবারের বিভিন্ন উপাদানে সমন্বয়ে হলে অবশ্যই মিশ্রন সমসত্ত্ব হবে
- খাবারের স্বাদও গন্ধ সহজেই মাছকে প্রলুব্ধ করবে
- পানির সাথে খুব কম সময়ে খাবার মিশে যাবেনা
- খাবার অবশ্যই ছত্রাক মুক্ত এবং বিষ মুক্ত হবে
- মানসম্পন্ন খাবার প্রয়োগে সব মাছ প্রায় (একই প্রজাতির হলে) সমান ওজনের হবে
- খাবার অধিক সময় সংরক্ষণ করা যাবে

- খাবার প্রয়োগের ২০-৩০ মিনিটের মধ্যে মাছ সব খাবার খেয়ে নেবে
- খাবার অধিক সময় সংরক্ষণ করা যাবে।

খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

পোনা ছোট অবস্থায় নার্সারি. স্টার্টার ফিড একটি নির্দিষ্ট পাত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়ে হাত দিয়ে বা ছোট প্লেট/বাটি দিয়ে পুকুরের দুই বা তিনটি স্থানে ছিটিয়ে দিতে হবে। এই ভাবে মাছের বয়স অনুসারে খাদ্যের গ্রেড ও পরিমাণ পরিবর্তিত হতে থাকবে এবং প্রয়োগ পদ্ধতি একই থাকবে।

খাদ্য প্রয়োগের সময় ঃ

মাছ দিনের বেলায় খাদ্য গ্রহণ করে। সকাল ৭-৮টায় প্রথম বার, ১২-১ টায় দ্বিতীয়বার এবং ৪-৫ টায় আর একবার (তিনভাগের একভাগ করে) খাবার দেয়া ভাল।

সবুজ খাদ্য প্রয়োগ ঃ

পুকুরে গ্রাসকার্প ও সরপুঁটি মজুদ করা হলে এবং বড় হয়ে এরা ক্ষুদিপানা খাওয়া শুরু করলে নিয়মিত তা প্রয়োগ করতে হবে। ক্ষুদিপানার পরিমাণ মজুদকৃত পোনার মোট ওজনের ৪০-৫০% পর্যন্ত হতে পারে। পুকুরে প্রয়োগের আগে ক্ষুদিপানা পানিতে ধুয়ে নেয়া উচিত। তা না হলে মাছ ক্ষত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। গ্রাস কার্প ও সরপুঁটির জন্য ক্ষুদিপানা, বাঁশ বা অন্য কোন উপযুক্ত উপকরণ দিয়ে তৈরি চৌকোণাকার ভাসমান ফ্রেমের মধ্যে দিতে হবে। ফ্রেমটি পাড়ের ৩-৬ ফুট দূরত্বে স্থাপন করতে হয়।

খাদ্য প্রয়োগে সর্তকতা

- প্রতি মাসে পোনার দৈহিক বৃদ্ধির সাথে হিসাব করে খাদ্যের প্রয়োগমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।
- পুকুরের পানি অতিরিক্ত সবুজ হলে খাদ্য প্রয়োগ মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে বা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে।

অধিবেশনঃ-১১

নমুনায়নের মাধ্যমে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পরবর্তী করণীয়

নমুনায়ন এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে মাঝে মাঝে পুকুরে জাল টেনে পুকুরের সকল মাছের মোট ওজন এবং মাছের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়।

নমুনায়নের প্রয়োজনীয়তা:

- পুকুরের মোট মাছের ওজন জানা যাবে।
- মাছের বৃদ্ধির হার জানা এবং প্রয়োগকৃত খাদ্যের খাদ্যমান সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাবে।
- মাছের খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা যাবে।
- মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা যাবে।
- রোগাক্রান্ত মাছের রোগ নির্ণয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

নমুনায়নের পদ্ধতি:

- ছোট এবং বড় আকারের মাছ নিয়ে নমুনায়ন করতে হবে।
- প্রতিটি প্রজাতির মোট সংখ্যার ১০% মাছ ধরতে হবে।
- নুমনায়নে বেড় জাল ব্যবহারে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।
- নমুনায়নভুক্ত মাছ সমূহ পর্যবক্ষেণ ও ওজন গ্রহনের পর দ্রুত আলতো ভাবে পানিতে পুনঃরায় ছেড়ে দিতে হবে।
- পোনা মজুদের পর প্রতিমাসে একবার নমুনায়ন করতে হবে।

অধিবেশন-১২

মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষে কিছু সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধান

মাছ চাষে বিভিন্ন সমস্যা	কারণ	প্রতিকার

মাছের খাবিখাচ্ছি খাওয়া • পুকুরে এটি একটি সাধারণ সমস্যা। • আগস্ট-সেপ্টেম্বর এবং এপ্রিল-মে মাসে বেশি দেখা যায় • সাধারণত মাঝ রাত হতে ভোর বেলায়।	• অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলে • মজুদ ঘনত্ব বেশী হলে • অতিরিক্ত সার প্রয়োগ করলে • অতিরিক্ত জৈব পদার্থের পঁচন • পানির উপর সবুজ বা লাল স্তর।	• বাঁশ পিটিয়ে/সাঁতার কেটে পুকুরে অক্সিজেন সরবরাহ করা। • পুকুরে পরিস্কার পানি সরবরাহ এবং কৃত্রিমভাবে পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করা। • সার ও খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখার পাশাপাশি মজুদ ঘনত্ব কমিয়ে ফেলা।
সবুজ স্তরঃ • রাতের বেলায় অক্সিজেন কমে যায় এবং P^H বেড়ে যায়।	• অতিরিক্ত শ্যাওলার জন্য পানির বরং ঘন সবুজ হয়ে যায়। • অধিক প্লাংকটন মারা যাবার ফলে বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি হয়।	• পুকুরে সার ও খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখা। • সিলভকার কার্পের মাধ্যমে জৈবিক নিয়ন্ত্রণ। • পুকুরে ক্ষুদিপানা ছেড়ে দেওয়া। • ১০% পানি বদল।
লাল স্তরঃ • সূর্যের আলো পানিতে পড়তে পারে না। • অক্সিজেন ও খাবারের ঘাটতি দেখা দেয়।	• অতিরিক্ত লৌহ অথবা লাল শেওলার উপস্থিতি।	• কলা পাতা পেঁচিয়ে বা মোটা দড়ির সাহায্যে লাল স্তর তুলে ফেলা। • শতাংশে ১২৫ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার পানিতে গুলিয়ে লাল স্তরে উপরে প্রয়োগ করা যেতে পারে। • শতাংশে ১০০ গ্রাম হারে ফিটকিরি পানিতে গুলিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
ঘোলাত্বঃ • সূর্যের আলো পানিতে কম প্রবেশ করে ফলে উৎপাদন গোবর বাধা গ্রস্থ হয়। • মাছের ফুলকা নষ্ট হয়। • পানিতে খাদ্য তৈরী হয় না।	• বৃষ্টি ধোয়া পানি পুকুরে এলে পানি ঘোলাটে হতে পারে।	• ভাঙ্গা পাড় মেরামত করা এবং পাড়ে ঘাস লাগানো। • শতাংশ প্রতি ৮-১০ কেজি হারে গোবর প্রয়োগের পর চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে। • শতাংশ প্রতি ১-২ কেজি জিপসাম ব্যবহার করেও ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে।

অধিবেশন-১৩
এক নজরে মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাষ পদ্ধতি

তেলাপিয়া মাছের তিনটি প্রজাতি বাংলাদেশে আমদানি করা হয় ১৯৫৪ সালে। প্রথম যে প্রজাতি আমদানি করা হয় তার নাম মোজাম্বিকা। এরপর ১৯৭৪ সালে থাইল্যান্ড থেকে আনা হয় নাইলোটিকা। সবশেষে ১৯৯৪ সালে ফিলিপাইন থেকে আনা হয় গিফ্ট নাইলোটিকার জাত। প্রজনন ও জেনেটিক গবেষণার মাধ্যমে এটিকে উন্নত জাতে রূপান্তর করা হয়েছে যা স্থানীয় জাত থেকে ৫০%-৬০% বেশি উৎপাদনশীল।

তেলাপিয়া মাছ চাষে স্ত্রী মাছের পোনা উৎপাদনে মাছের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়ে মোট উৎপাদন কমে যায়। সম্প্রতি এই সমস্যা দূরীকরণে হরমোন (Androgen) প্রয়োগ পূর্বক মনোসেক্স তেলাপিয়া উৎপাদন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের সকল গ্রামেই অসংখ্য পুকুর ডোবা আছে সেখানে সারা বছর পানি না থাকলেও ৫-৮ মাস পানি থাকে। বাড়ির আশ-পাশের এসব পুকুর ও ডোবায় অতি সহজে মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ করা যায়। মনোসেক্স তেলাপিয়া এমন একটি জাতের মাছ যা সহজেই যে কোন পরিবেশে অল্প সময়ের জন্য চাষ করা যায়। বাণিজ্যিক চাষাবাদ অত্যন্ত লাভজনক বিধায় মৎস্য চাষীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

তেলাপিয়া চাষের সুবিধাবলী

- খেতে সুস্বাদু
- উচ্চ ফলনশীল ও দ্রুত বর্ধনশীল।
- ছোট বা মাঝারী আয়তনের পুকুরে এবং মৌসুমী পুকুরে চাষ করা যায়।
- সহজেই পোনা উৎপাদন করা যায়। ৩-৪ মাসেই বিক্রয় যোগ্য হয়।
- বাজার মূল্য ভাল বলে লাভজনক।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি।
- অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায় (প্রতি শতকে ২৫০-৩০০টি)।
- মাছটি ৯-৩৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সহজেই টিকে থাকতে পারে।

অধিবেশনঃ-১৪
মাছের বিভিন্ন রোগ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা

রোগ হচ্ছে যে কোন প্রাণীর দেহের অস্বাভাবিক অবস্থা যা বিশেষ কিছু লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ পায়। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মাছেরও নানা ধরনের রোগ বালাই হতে দেখা যায়। রোগ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে পুকুরে মাছ মারা যায়।

রোগের কারণ ঃ

জলজ পরিবেশের চাপ, রোগ জীবাণু এবং পোনার অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। সেজন্য পোনার রোগাক্রান্তহওয়ার পিছনে একাধিক কারণ বা বিষয় কাজ করে। মাছের রোগের চিহ্নিত কারণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

- পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণের অবনতি (পানির তাপমাত্রা, পঁচা জৈব পদার্থ, পিএইচ, দ্রবীভূত অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি)
- অতিরিক্ত সার ও খাদ্য প্রয়োগ
- ময়লা দূষিত পানির প্রবেশ
- অধিক মজুদ ঘনত্ব
- প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব
- ত্রুটিপূর্ণ পরিবহণ ও হ্যান্ডেলিং
- পরজীবী ও রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর সংক্রমণ।

রোগের লক্ষণ ঃ

- ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং ছন্দহীনভাবে পানির উপর সাতার কাটতে থাকে
- শরীরের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলে
- খাওয়া দাওয়া কমিয়ে দেয় বা একেবারে বন্ধ করে দেয়
- পানির উপর ভেসে খাবি খাচ্ছি করে
- ফুলকার স্বাভাবিক রং নষ্ট হয়ে যায়

- দেহের উপর লাল/কালো/সাদা দাগ পড়ে
- দেহে বিজল থাকে না, দেহ খসখসে হয়ে যায়
- পোনা পানিতে ডুবন্ত কোন কিছুর সাথে গা ঘষতে থাকে
- চোখ ফুলে যায় বা বাইরের দিকে বের হয়ে আসে।

পোনা ছাড়ার পর সার্বিক সতর্কতা ঃ

- ছাড়ার ৫-৭ দিনের মধ্যে পুকুরে জাল টানা ঠিক নয়
- ভেসে উঠলে পানির ঝাপটা দিতে হবে। নতুন পানি যোগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।
- পুকুরের পানির রং লালচে সবুজ এবং সেকিডিস্কেও দৃশ্যমানতা ২০-৩০ সে. মি. এর মধ্যে থাকা উচিত
- পোনার খাদ্য অত্যন্ত মিহি হতে হবে
- সূর্য ওঠার ৫-৬ ঘন্টা পর 'হররা' টানা উচিত। অক্সিজেন ঘাটতি থাকা অবস্থায় এবং পোনা ছাড়ার পর প্রথম ২-৩ দিন হররা টানা উচিত নয়
- মেঘলা দিনে সার, চুন ও খাদ্য দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে
- কুড়া ব্যবহার করলে তুষ পরিহার করে মিহি কুড়া ব্যবহার করতে হবে।

আমাদের দেশে পোনা মাছে দেখা যায় এরূপ কিছু সাধারণ রোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা নিচে উল্লেখ করা হলো-

১. লেজ ও পাখনা পচাঁ রোগ ঃ

এ রোগ সাধারণতঃ অ্যারোমোনাস ও মিক্সো ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে মাছ রোগে আক্রান্ত থাকে।

লক্ষণ ঃ

- পোনা দেহ ঘোলাটে বর্ণ ধারণ করে
- ত্বকের পিচ্ছিলতা কমে যায়
- প্রাথমিক পর্যায়ে লেজ ও পাখনায় লাল দাগ দেখা যায়
- পাখনার পর্দা ছিড়ে যায় এবং আস্তে আস্তে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়

প্রতিকার ঃ

- প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত পাখনা কেটে ফেলে ২.৫% লবণ পানিতে ২-৩ মিনিট গোসল
- পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ($KMnO_4$) দ্রবণে ২-৩ বার গোসল

প্রতিরোধ ঃ

- শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে পুকুরে চুন প্রয়োগ

২. ফুলকা পঁচা রোগ ঃ চাইনিজ কার্প ও দেশী কার্প মাছের পোনায় এ রোগ বেশি হতে দেখা যায়। ব্রাঙ্কিওমাইসিস নামক এক প্রকার ছত্রাকের সংক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। জলাশয়ের তলদেশে অতিরিক্ত কাঁদা থাকলে ছত্রাকের সংক্রমণ বেশি হয়ে থাকে।

লক্ষণ ঃ

- ফুলকায় গোল লাল দাগ দেখা যায়
- পরে ফুলকাটি সাদা হয়ে যায় ও ভেঙ্গে পড়ে

প্রতিকার

- প্রাথমিক অবস্থায় শতাংশ প্রতি ০.৫ কেজি হারে চুন প্রয়োগ
- সাময়িকভাবে সার ও খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ করে সম্ভব হলে ১০-২০% পানি পরিবর্তন
- ২-৩% লবণ জলে সহ্য ক্ষমতা পর্যন্ত গোসল

প্রতিরোধ ঃ

- পুকুর প্রস্তুতকালে অপ্রয়োজনীয় কাঁদা অপসারণ করলে ফুলকা পঁচা রোগ থেকে সাবধান থাকা যায়।

৩. সাদা দাগ রোগ ঃ

পোনার ঘনত্ব বেশি হলে এ রোগ বেশি সংক্রমিত হয়

লক্ষণ ঃ

- পোনার ত্বক, লেজ ও পাখনায় সাদা দাগ
- ত্বকে সাদা সাদা গুটি
- দেহের পিচ্ছিলতা কমে যায়
- জোরে জোরে সাঁতার কাটতে থাকে
- মুখ হা করে পানির উপর ভাসতে থাকে

প্রতিকার ঃ

- ২% লবন দ্রবনে ১ মিনিট করে অন্তত একনাগারে সাতদিন গোসল করাতে হবে

প্রতিরোধ ঃ

চুন ১ কেজি হারে প্রতি শতাংশে ২ বারে গুলিয়ে দিতে হবে।

মাছের কয়েকটি সাধারণ রোগের লক্ষ্যণ ও প্রতিকার:

রোগ, *প্রজাতি, সময়*	**লক্ষণ**	**কারণ**	**প্রতিকার**
৪) মাছের ক্ষত রোগ ***প্রজাতি*:** পুঁটি, শোল, টাকি, মেনী মাছ এবং কার্প জাতীয় মাছ এ রোগে আক্রান্তহতে পারে। ***সময়*:** শীতকাল	• মাছের দেহের বিভিন্ন অংশে ঘাঁ হয়	• পুকুরে দূষিত পরিবেশ ও জৈব পদার্থের উপস্থিতি	• শতাংশে ১ কেজি চুন ও ১ কেজি লবণ ২ সপ্তাহে ২ বারে প্রয়োগ করতে হবে। • ১০ লিটার পানিতে ১ চা চামচ পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণে আক্রান্তমাছকে গোসল করানো।
৫) লেজ ও পাখনা পঁচা রোগ ***প্রজাতি* :** সব ধরণের মাছের প্রজাতি এ রোগে আক্রান্তহতে পারে। ***সময়* :** গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল	• লেজ ও পাখনা পঁচে যেতে পারে। • পাঁখনা ছিড়ে সাদা হয়ে যায়।	• পুকুরের তলায় অতিরিক্ত জৈব পদার্থের উপস্থিতি	• শতাংশে ২৪-৩৬ গ্রাম/ফুট পানির গভীরতায় পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট প্রয়োগ করতে হবে অথবা • শতাংশ প্রতি ৬ গ্রাম/ফুট পানির গভীরতায় তুঁতে প্রয়োগ করতে হবে।
৬) মাছের ড্রপসি রোগ ***প্রজাতি*:** কাতলা, রুই ও মৃগেল মাছ ***সময়*:** গ্রীষ্মকাল	• পেট ফুলে বেলুনের মত হয়ে যায়। • পেটে ও আঁইশের নীচে পানি জমে যায়। • চামড়ায় ঘাঁ হয় এবং অন্ত্র ফুলে যায়।	• পুকুরের তলায় অতিরিক্ত জৈব পদার্থের উপস্থিতি	• প্রতি ৪০০ গ্রাম ওজনের জন্য ৩ মিলিগ্রাম অক্সি টেট্রা সাইক্লিন ইনজেকশন দেওয়া যেতে পারে। • সিরিঞ্জ দিয়ে পেটের পানি বের করে নিতে হবে। তারপর ২১/২% লবণ পানিতে ৩-৫ মিনিট মাছকে গোসল করাতে

রোগ, *প্রজাতি*, *সময়*	লক্ষণ	কারণ	প্রতিকার
			হবে।
৭) মাছের লাল ফুটকি রোগ ***প্রজাতি***: সিলভার কার্প বেশী আক্রান্তহতে পারে। ***সময়***: শীতকালের পরপরই	• দেহের বিভিন্ন অংশে লাল-দাগ দেখা যায়। • দাগগুলোতে টিপ দিলে রক্তের মত বের হয়।	• পুকুরের তলায় বেশী কাঁদা ও অতিরিক্ত মজুদ ঘনত্ব	• শতাংশে ১ কেজি চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে। • শতাংশে ২৪-৩৬ গ্রাম/ফুট পানির গভীরতায় পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট প্রয়োগ করতে হবে অথবা • মজুদ ঘনত্বহ্রাস করতে হবে।
৮) মাছের ফুলকা পঁচা রোগ ***প্রজাতি***: চাইনিজ কার্প এবং দেশীয় কার্প বেশী আক্রান্তহতে পারে ***সময়***: বছরের প্রায় সব সময়ই	• ফুলকায় লাল গোল দাগ দেখা যায়, পরে ফুলকাটি সাদা হয়ে যায় এবং অকর্মণ্য হয়ে পড়ে।	• ছত্রাক ও পুকুরের তলায় বেশী কাঁদা	• শতাংশে ০.৫ কেজি চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে। • আক্রান্তমাছকে ২-৩% লবণ জলে ৩-৫ মিনিট গোসল করালে ভাল হবে।
৯) মাছের উঁকুন ***প্রজাতি***: রুই, মৃগেল এবং পরে অন্যান্য মাছ এ রোগে আক্রান্তহতে পারে। ***সময়***: গ্রীষ্ম ও বর্ষা কাল	• মাছ অবিরাম ছুটাছুটি করে • কোন কিছুর সাথে গাঁ ঘষতে থাকে • দেহ লাল বর্ণ ধারণ করে • দেহের বিভিন্ন স্থানে ক্ষতের সৃষ্টি হয় • লক্ষ্য করলে আঁইশের উপর ক্ষুদ্র উঁকুন দেখা যায়।	• পুকুরের তলায় বেশী কাঁদা ও অতিরিক্ত জৈব পদার্থের উপস্থিতি	• ডিপটারেক্স প্রতি শতাংশে ৬-১২ মিলি/ফুট, সপ্তাহে ১ বার, ৪ সপ্তাহ প্রয়োগ করতে হবে। • সুমিথিয়ন- প্রতি শতাংশে ১.২-১.৮ গ্রাম/ফুট সপ্তাহে ১ বার, ৪ সপ্তাহ প্রয়োগ করতে হবে।।

অধিবেশনঃ ১৫
আংশিক আহরণ ও পুনঃমজুদ

পোনা ছাড়ার ২-৩ মাসের মধ্যে কিছু কিছু মাছ বাজারজাত উপযোগী হলে সেগুলো ধরে বিক্রির ব্যবস্থা নিতে হবে। বিক্রিত মাছের সংখ্যার সমান-সংখ্যক এবং অতিরিক্ত হিসেবে ১০% বেশি ৪-৫ ইঞ্চি আকারের পোনা পরবর্তী ফসলের জন্য পুনঃমজুদ করা যেতে পারে।

মাছ আহরণঃ

- আংশিক আহরণে অধিক উৎপাদন পাওয়া যাবে।
- পুকুরের ধারণ ক্ষমতা পূর্ণ হয়ে গেলে মাছ আর বাড়ে না, ফলে আংশিক আহরণের মাধ্যমে ছোট মাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা যায়।
- খাদ্য ও সার প্রয়োগে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

- মাছ আংশিক আহরণের পর পূনঃরায় সমপরিমাণ বা ১০% মাছ অতিরিক্ত মজুদের পুনঃমজুদ করতে হবে।

আহরণের আগে চাষির প্রস্তুতি ও আহরন কালীন সাবধানতাঃ

- উপযুক্ত পরিবহণ যানসহ মৎস্য ক্রেতা আগেই নির্ধারিত রাখা।
- রাতে ধরার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ধৃত মাছ ভালভাবে ধোয়ার জন্য পরিস্কার পানির ব্যবস্থা করা।
- ধরার সময় মাছ যাতে আঘাত প্রাপ্ত না হয় সে জন্য যথা সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করা।
- মাছ ধরেই তা ছায়ায় রাখার জন্য খামারে উপযুক্ত ছাউনির ব্যবস্থা করা।
- মাটি, ঘাস, বাশের ঝুড়ি ও চাটাই, হোগলার পাটি, চট ইত্যাদির উপর মাছ না রেখে মসৃন পাকা, প্লাস্টিক সিটের উপর রাখা।
- বরফ শীতল পানি দিয়ে মাছ মারলে এর গুনগত মান ভাল থাকে তাই বরফ শীতল পানির ব্যবস্থা রাখা এবং প্রয়োজনীয় পাত্রের ব্যবস্থা রাখা।
- মৃত মাছ ১:২ আনুপাতিক হারে বরফ দিয়ে পরিবহন করতে হয়, তাই আহরনের আগে প্রয়োজনীয় বরফ সংগ্রহ করতে হবে।

মাছ বাজারজাত করণঃ

- ভাল দাম পেতে হলে মাছ আহরণের পর বিক্রি পর্যন্তযত্নের সাথে মাছ সংরক্ষণ করতে হবে।
- পরিস্কার ঠান্ডা পানি দিয়ে মাছের পাত্র ও মাছ ভাল ভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে (কাঁদা বা অপরিস্কার থাকলে সহজেই মাছের রঙ বিবর্ণ হয়ে যায় এবং ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সহজেই আক্রান্তহয় বলে মাছে পচন ধরে এবং বাজার মূল্য অনেক কমে যায়)।
- দূরবর্তী স্থানে বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে পরিস্কার পানিতে ধুয়ে ঝুড়িতে বা বাক্সে বরফ চূর্ণ দিয়ে সম্পূণ আবৃত করে বাক্সের মুখ বন্ধ রাখতে হবে। এভাবে মাছ ১৪-১৮ ঘন্টা সংরক্ষণ করে বিক্রি করা যায়।
- মাছ পরিবহনের জন্য খামারের নিজস্ব যান থাকলে ভাল হয়।
- বছরের যে সময় গুলোতে মাছ বিক্রি করলে ভাল দাম পাওয়া যেতে পারে, সে সম্পর্কে আগে ধারণা রাখতে হবে।
- মাসের প্রথম দিকে শীতকালে, পূজা-পার্বনে ও রমজানে মাছের চাহিদা বেশী ও ভাল দাম পাওয়া যায় এবং আয়ও ভাল হয়।
- দূরবর্তী স্থানে মাছ পরিবহণ করলে ১ঃ১ অনূপাতে বরফ ব্যবহার করে মাছ ৭-৮ দিন সংরক্ষণ করা যায়।
- কাঠের বা প্লাস্টিকের বাক্সে উপরোক্ত উপায়ে মাছ সংরক্ষণ করলে মাছের গায়ে চাপ পড়ে না, ফলে অন্যান্য গুণাগুণসহ মাছ ভাল থাকে।

-: সমাপ্ত :-